মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী

(ময়মনসিংহ)

প্রমথ গুপ্ত



ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড

জানুয়ারী ১৯৬৪

প্রকাশক :
পীযূষ দাশগুপ্ত

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ. লিঃ.
১২ বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়
এভারেস্ট প্রিন্টার্স।
৫৭এ বেচু চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯



প্রচ্ছদ :
খালেদ চৌধুরী

শহীদদের উদ্দেশ্যে

"মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী"র লেখক পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জিলায় জন্মেছেন। কিশোর বয়সে তিনি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের ('যুগান্তর' গ্রুপের) সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি তিন মাস জেলও খাটেন। ১৯৩১ সালে তিনি "শালধা ডাকাতি" মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হন এবং বিচারে বে-কসুর ছাড়া পেয়ে যান। সেকালে বৈপ্লবিক কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা ডাকাতি ক'রেও অর্থ সংগ্রহ করতেন।

কথায় বলে 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা'। ডাকাতির মোকদ্দমা হতে বে-কসুর খালাস পেয়েও কমরেড প্রমথ গুপ্ত রেহাই পেলেন না। ১৯৩২ সালে ভারতের ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁকে বিনা বিচারে বন্দী করলেন এবং তাঁকে ক্রমান্বয়ে পাঁচ বছর কাটাতে হলো হিজলী ও দেউলির বন্দীশিবিরে। তারপরে তিনি কিছুকাল আটক থাকলেন উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রামে। বন্দীদশায় অন্য অনেক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের মতো কমরেড প্রমথ গুপ্তও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯৩৮ সালে তিনি মুক্তি পান। তারপরেই হয় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তখন বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ছিল। তবে, নানান কারণে, বিশেষ করে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় আমার বিচার হওয়ায় বন্দীশিবিরে ও জেলে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-পড়া মুক্ত রাজবন্দীরা ধ'রে নিতেন যে আমি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একজন সভ্য। তাঁরা আমার নিকটে এসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে তাঁদের যোগ দেওয়ার ইচ্ছা আমায় জানাতেন। ১৯৩৮ সালে কমরেড প্রমথ গুপ্তও এই সূত্র ধরেই আমার নিকটে এসেছিলেন

এবং বলেছিলেন যে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে চান। তখনকার দিনের নীতি অনুসারে আমি তাঁকে তাঁর নিজের জিলা ময়মনসিংহে গিয়ে কৃষক সংগঠন গড়ে তুলতে অনুরোধ করেছিলেম এবং ব'লে দিয়েছিলেম যে এই কাজের ভিতর দিয়েই তাঁকে পার্টির সভ্যপদ অর্জন ক'রে নিতে হবে। বলা বাহুল্য, তিনি পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেছিলেন।

ময়মনসিংহ জিলার আদিবাসী অঞ্চলের কৃষকদের কৃষক সমিতিতে সঙ্ঘবদ্ধ করার অবিরাম চেষ্টাই শুধু তিনি করেননি, আদিবাসী কৃষকেরা যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছেন সেই সংগ্রামেরও তিনি একজন সংগঠক। ব্রিটিশ আমলে তিনি এই সংগ্রামে লিপ্ত তো ছিলেনই, দেশ ভাগ হওয়ার পরেও, অর্থাৎ পাকিস্তানী আমলেও তিনি সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছেন।

ভারতের কত জায়গায়, দেশ ভাগ হওয়ার পরে ভারত ও পাকিস্তানের কত জায়গায় জনগণের কত সংগ্রাম যে হয়ে গেছে কালীর আঁচড়ের ভিতরে ধরে না রাখলে দেশ এই সকল সংগ্রামের কথা বিলকুল ভুলে যাবে। অথচ এই সমসাময়িক ঘটনাগুলি জড়ো করেই তো ভবিষ্যতের ইতিহাস রচিত হবে। ধনিক-বণিক-জমীদারের পার্টি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আজ ভারতের শাসন ক্ষমতায় জাঁকিয়ে বসেছেন। এই ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে বিরামহীন প্রচারের দ্বারা তাঁরা জনসাধারণের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিচ্ছেন যে কংগ্রেসই দেশে স্বাধীনতা এনেছেন। কথাটা ষোল আনা সত্য নয়। দেশের স্বাধীনতা লাভে কংগ্রেসের কোনো অবদানই নেই এমন কথা আমি বলতে চাইনে, কিন্তু স্বাধীনতা এসেছে বহুকালের বহু সংগ্রামে হাজার হাজার লোকের জীবন বলিদানের ভিতর দিয়ে। ভারতের বহু জায়গায় বহু কৃষক-অভ্যুত্থান হয়েছে। তার অনেকগুলি সশস্ত্র অভ্যুত্থান। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন আমাদের জীবনকালের

ঘটনা। সব কিছুর ওপরে আমরা দেখেছি নৌবিদ্রোহ। এই নৌ-বিদ্রোহই শেষে ব্রিটিশের মন ভেঙে দিয়েছিল। তাঁরা বুঝেছিলেন এই দেশের শাসন ক্ষমতায় তাঁদের আর থাকা চলবে না। ইংরেজ এই দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হওয়ায় তাঁদের সমশ্রেণীব কংগ্রেসের হাতে আপোসে ক্ষমতা দিয়ে গেছেন। কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করেনি। পাকিস্তানে মুস্‌লিম লীগ সম্বন্ধেও এই একই কথা। এক সময়ে কংগ্রেসের মঞ্চ হতে স্বাধীনতাব কথা উচ্চারণ করাও নিষিদ্ধ ছিল। তার লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে ডোমিনিয়ন স্টেটাস্‌ লাভ। ১৯২৮ সালের মোতিলাল নেহরু কমিটির কথা কে না জানেন?

কমরেড প্রমথ গুপ্ত তাঁর অভিজ্ঞতা হতে "মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী" লিখেছেন। যে-সব কথা দেশ হয় তো ভু'লে যেত সে-সব কথা তিনি যে ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের জন্যে লিখে রাখলেন তার জন্যে তাঁকে আমি অভিনন্দন জানাই।

কলকাতা
১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

ভূমিকা

সাগব পার হয়ে এসে খ্রীষ্টান পাদরিরা আজ কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের দেশের বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে ধর্মপ্রচার ব্যপদেশে বসবাস করেছেন, তাদে [illegible] রীতি-নীতি ইত্যাদি আলোচনা করেছেন, ভারতের সামগ্রিক জীবন থেকে যাতে বিচ্ছিন্ন [illegible] থেকে দেশের সংহতিকে দুর্বল করে ফেলে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সেই চেষ্টায় লেগে থেকেছেন এদের দোষ দিয়ে নিজেদের দোষস্খালনের অভ্যাস আমাদের আছে, কিন্তু সে-অভ্যাস ছাড়তে পারলেই মঙ্গল। শ্রীযুক্ত প্রমথ গুপ্ত ময়মনসিংহের পার্বত্য সীমান্তের আদিবাসীদের নিয়ে এই গ্রন্থটি রচনা করে তাই আমাদের ধন্যবাদার্হ।

দেশ বিভাগের মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রহ করার কিছু আগে ময়মনসিংহ জেলার হাজং কৃষকেরা 'তেভাগার' লড়াইয়ে দেশজোড়া খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আজ পাকিস্তানের উদ্ভট রাজনৈতিক আবহাওয়ায় অ-মুসলমান বলে উপেক্ষিত জীবন-যাপন তাঁরা করেছেন। সর্ববিধ জনপ্রচেষ্টা সেখানে স্তব্ধ-শৃংখলিত অবস্থায় আছে বলে নিরন্তর অস্বস্তির মধ্যে বাস করছেন। তাঁদের কথা আমরা যখন ভুলতে বসেছি তখন এ-বইয়ের প্রকাশ খুবই সময়োচিত হয়েছে।

আমাদেরই দেশের আদিবাসী যারা, তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, আগ্রহ ও সৌহার্দ্যের অভাব আমাদের যে কবে ঘুচবে, কে জানে? আমরা মাঝে মাঝে বলেই খুশী যে আমাদের ইতিহাসে আছে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা, আদিম সভ্যতাকে প্রগতির রথচক্রে নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে ফেলার মনোবৃত্তি আমাদের পূর্বপুরুষেরা দেখাননি। কথাটা যে ভুল, তা নয়।

ভারতবর্ষের বহুমুখী, জটিল সংস্কৃতিতে আদিবাসীদের স্থান আছে, বেশ সহজ ও স্বচ্ছভাবেই আছে। কিন্তু জাতিভিত্তিক সমাজে এই স্বাধীনতাপ্রিয় আদিবাসীরা উপেক্ষিত হয়ে এসেছে। এখনও তাদের সম্পর্কে আমাদের মনোভাব প্রকৃত সহানুভূতির সিঞ্চনে বিকশিত হয়নি।

এটা যে একান্ত পরিতাপের বিষয় তা বহু সূত্র থেকেই আমরা বুঝি। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সরল আদিবাসীদের সত্যসন্ধতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর দরাজ বুকে বাংলা-বিহারের সাঁওতালরা মস্ত বড় একটা জায়গা জুড়ে থেকেছে। যারাই আমাদের আদিবাসীদের কোলে টানতে পেরেছে, তাদের কাছেই আমরা জেনেছি তাদের স্বভাব-মাধুর্যের কথা।

কিন্তু শুধু প্রকৃতির শিশু হিসাবে তাদের দেখলে প্রচণ্ড ভুল ঘটবে। একটা জায়গায় আমাদের আদিবাসীরা একেবারে সুপরিণত, নিজেদের সত্তা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সজাগ। ঠিক এ জন্যই দেখি যে দেশের দুর্দশায় তারা মূক বধির অবস্থায় স্থির হয়ে থাকেনি, লড়াইয়ের ময়দানে অকুতোভয় মন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

কেন যে আমরা মনে রাখি না ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা, যা ইংরেজ রাজত্বের আঁতে ঘা দিতে পেরেছিল? কার মনে আছে বারবার ছোটনাগপুরের কোল, মুণ্ডা, সাঁওতালদের অসম-সাহসিক অভ্যুত্থানের কথা, যা ঘটেছিল ১৮৩১, ১৮৭১, ১৮৯৮-১৯০০ সালে? তাদের নেতা ভগিরিৎ আর বিরসার কথা আমরা ক'জন জানা দরকার মনে করি? আজও যখন নাগা অঞ্চলে বিদ্রোহ হয়, কিম্বা আসামের পার্বত্য এলাকার উপজাতিদের হাজার নালিশ জড়ো হওয়ার খবর পাই, তখন ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ে বোধ হয় মনে করি যে এগুলো ছোটখাট আপদ, এর কোন অর্থ নেই, গোলাগুলি চালিয়ে সহজেই এদের দাবিয়ে রাখা চলে। আমাদের মধ্যে ক'জন ভাবি যে

প্রকৃতপক্ষে ভারত যখন স্বাধীন জীবন যাপন করবে, তখন এই আদি-বাসীদের মধ্য থেকেই তো আমাদের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নায়ক খুঁজে পাব—মধ্যপ্রদেশের জঙ্গল আর আসামের পাহাড় থেকে অনেক ভারতরত্নের সাক্ষাৎ পেয়ে আমরা গর্ব করব?

কথা বাড়াবার দরকার নেই। হাজংদের কাহিনী নিয়ে গ্রন্থকার বইটি লিখেছেন, দরদ দিয়ে লিখেছেন, যথাসাধ্য অনুসন্ধান করে লিখেছেন। তিনি নিজে ময়মনসিংহের গারো পাহাড় এলাকায় বহুদিন থেকেছেন, হাজং প্রভৃতি উপজাতীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। একেবারে পক্ষপাতহীন পণ্ডিতী বিবরণ লিখতে ইনি পারেননি—সেজন্য পাঠকই তাঁকে ধন্যবাদ দেবেন। পক্ষপাত পরিপূর্ণ যিনি বর্জন করতে পারেন, তিনি তুরীয় মার্গে বাস করতে পারেন, কিন্তু ইতিহাস লেখা তেমন ব্যক্তির কর্ম নয়। প্রমথবাবুর এই আদিবাসীদের সম্বন্ধে পক্ষপাত আছে, আর থাকবে না-ই বা কেন? তিনি কিশোর বয়স থেকে রাজনীতি করেছেন, ইংরেজ আমলে বহু বৎসর রাজবন্দী থেকেছেন, মার্কসবাদকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। কৃষক-আন্দোলনে সক্রিয় থেকেছেন। আমি তাঁর এই লেখাকে স্বাগত জানাচ্ছি, আর চাইছি যে এর যেন বহুল প্রচার ঘটে।

কলিকাতা
২৭. ১১. ৬৩

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

লেখকের কথা

আমি লেখক নই। লেখা আমার পেশা নয়, শখও নয়। তবুও কেন এই বই লেখায় হাত দিলাম? ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এম, পি, মহাশয় যাহা বলিয়াছেন—তাহাই আমার অন্তরের কথা। তাঁহার লেখা এই ভূমিকা বইখানার মূল্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

আমার বিশ্বাস ১৭৫৭ সালের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের যেখানে যত কৃষি সংগ্রাম বা কৃষক বিদ্রোহ হইয়াছে, তাহার মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার কৃষকদের খণ্ড বিক্ষিপ্ত স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগের আন্দোলনগুলি তো আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাই ময়মনসিংহ জেলার কৃষক সংগঠন ও কৃষকদের বহুমুখী সংগ্রাম এক সময় সারা ভারত কৃষক আন্দোলনকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিত। আজ পৃথক এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের অতীত অবদানকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। সংগ্রামী কৃষকদের দৃপ্ত জীবন ও গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলির কথা ভুলিতে পারি না। তাঁহাদের আত্মবলিদান স্বার্থত্যাগের আদর্শ আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অতুলনীয় সম্পদ হইয়া রহিয়াছে।

আমি জানি, ময়মনসিংহ জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিবৃত্ত কয়েক-জন লেখক ও রাজনৈতিক নেতা বিশদভাবেই জানেন। তাঁহারা লিখিলে খুব ভালই হইত। দেশ বিভাগের বিপর্যয়ে ও বর্তমান পরিস্থিতিতে হয় তো তাঁহারা অন্যত্র ব্যাপৃত। অথচ আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের

একটি গৌরবময় অধ্যায় উপেক্ষায় ক্রমশ বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়া যাইতেছে। ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মতো কোন নিদর্শন থাকিতেছে না, এই কথা স্মরণ করিয়াই আমি আমার সমস্ত অক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়া ময়মনসিংহ জেলার কৃষক আন্দোলনের কিছুটা অংশ,—পাহাড় সীমান্ত অঞ্চলের কৃষকদের ঐতিহ্যময় আন্দোলনকে সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম। কারণ সমস্ত বিষয় বিশদভাবে বর্ণনার এখনও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় নাই। আমি আশা করি ভবিষ্যতে যে-কোন যোগ্য ব্যক্তি সমস্ত ময়মনসিংহ জেলার কৃষক আন্দোলনের এক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আরো উন্নততর ও বিস্তৃতভাবে রচনা করিবেন।

দেশ বিভাগের বিপর্যয়—পুনঃপুনঃ সাম্প্রদায়িক দাংগা এবং কায়েমী স্বার্থের অবিরাম অত্যাচার উৎপীড়ন সত্ত্বেও এই "এই আংশিক শাসন-সংস্কার বহির্ভূত" অঞ্চলের আদিবাসীগণ তাঁহাদের সুপ্রাচীন আবাসভূমি ত্যাগ করার কথা কল্পনা করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে নিতান্ত অনিবার্য কারণে নিরুপায় হইয়াই তাহারা নিজেদের আবাসভূমি চিরতরে ছাড়িতে বাধ্য হইতেছেন। এই সব উদ্বাস্তু আদিবাসীগণ আসামের গারো হীলস্, খাসি হীলস্, গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও দরং জেলার বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে আশ্রয় লইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া হাজং, ডালু ও হদি সম্প্রদায়ের কৃষকগণ শতাব্দীকাল যাবত বাঙালী হিন্দু-সংস্কৃতির প্রভাবে পরিবর্তিত হইতেছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন স্রোতধারার সাথে যুক্ত হইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। আজ আবার তাঁহাদের জীবন বিকাশের পথে এক কঠিন সংকট উপস্থিত। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা ও স্বাধীন ভারতের প্রগতিশীল গণআন্দোলনই তাঁহাদের একমাত্র ভরসা। এই ছিন্নমূল চাষীদের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

এই বইয়ের প্রথম রচনা পড়িয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন শ্রীজিতেন্দ্র নাথ সেন এবং পাণ্ডুলিপি 'কপি' করা হইতে শুরু করিয়া ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করা পর্যন্ত সমস্ত রকম পরিশ্রম ও পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন বন্ধুবর শ্রীজলধর পাল। আর হাজং নেতা ললিত সরকার প্রমুখ খ্যাত-অখ্যাত কৃষক ভাইদের কাছ হইতে পাইয়াছি বিভিন্ন তথ্য। তাঁহাদের সকলের সক্রিয় সাহায্য না পাইলে এই বই লেখার দায়িত্ব কিছুতেই পালন করিতে পারিতাম না। এই বইয়ে প্রকাশিত ফটোগুলি বিখ্যাত আলোকচিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত সুনীল জানার দান। তাঁহাদেব সকলের নিকট আমি ঋণী।

একদিন কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর নির্দেশ ও পরামর্শে কৃষক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলাম। আজ তাঁহার পরিচয় পত্র লইয়া বইখানা আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ইহা আমার পরম গর্বের কথা। আমার সম্পূর্ণ সত্তা যাঁহার কাছে ঋণী তাঁহাব কাছে নূতন ক রয়া ঋণ স্বীকারের অবকাশ কোথায়?

এই সুযোগে কৃতজ্ঞতা জানাই "ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড"-এর সমস্ত কর্মীদের, যাঁহাদের অলক্ষ্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এই বই আত্মপ্রকাশ করিল।

"বলরাম ভবন"
৪৩/১, শেঠ বাগান রোড
কলিকাতা—৩০

প্রমথ গুপ্ত
১০।১২।৬৩

পাহাড় সীমান্ত অঞ্চল

শিক্ষিত ভারতবাসী আদিবাসী সমাজ সম্বন্ধে খোঁজ খবর করলে আরও বহু আদিবাসী বীর ও শহীদের কথা জানতে পারবেন। আদিবাসীদের রাজনৈতিক তথা ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ ও আলোচনা ভারতীয় সমাজে সাধারণত দেখতে পাওয়া যায় না। বহু আদিবাসীদের শোণিত তর্পণ বহু পার্বত্য উপত্যকায় ও অরণ্যভূমিতে বহু পবিত্র বেদীস্থান রচনা করেছে। সে কাহিনী আজও নিরালা বনমর্মরের মতো ভারতীয় নাগরিকের কাছ থেকে দূরে সরে আছে। (ভারতের আদিবাসী — সুবোধ ঘোষ)

ময়মনসিংহ জেলার পাহাড় সীমান্ত অঞ্চলের আদিবাসী কৃষকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কাহিনী জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে আজও কোন স্থান পায় নাই। এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের হাজং, ডালু, কোচ, বানাই, হদি (ক্ষত্রিয়) ও গারো চাষীদের কৃষিবিপ্লব তথা ব্রিটিশ-বিরোধী মুক্তি সংগ্রামের ধারাবাহিক বিবরণ আজও আমাদের জাতীয় ইতিহাসে উপেক্ষিত ও অনাদৃতই রহিয়াছে। অথচ অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ও যুদ্ধোত্তর যুগের প্রতিটি মুক্তি-সংগ্রামে এই আদিবাসী কৃষকদের গৌরবময় ভূমিকা ও আত্মোৎসর্গ মোটেই নগণ্য বা ভুলিবার মতো নয়। ইহাদের সুদীর্ঘ সংগ্রাম একদিকে যেমন আঞ্চলিক, খণ্ড বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ ও স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান—অন্যদিকে আবার তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানবমুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ও সমআদর্শে উদ্বুদ্ধ। ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে ইঁহাদের আত্মবলিদান, স্বার্থত্যাগ ও সর্বপ্রকার নির্যাতন ও দুঃখবরণ বাস্তবিকই সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করিবার মতো,—আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর ইতিহাসে ইহা নিঃসন্দেহেই একটি গৌরবময় অধ্যায়। স্বাধীনতা-উত্তর যুগের শিক্ষিত ভারতবাসীদের কাছে এই সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান ও ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের অপেক্ষায় ইহার প্রধান প্রধান

সূত্রগুলিকে সযত্নে রক্ষা করাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালাইতে হইলে যেমন সকালেই সলিতা পাকাইতে হয় তেমনি গারোপাহাড় সীমান্তের এই আদিবাসী জনতার সংগ্রামের কাহিনী বর্ণনা করিতে হইলেও প্রথমেই প্রয়োজন এই অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান ও এখানকার আদিবাসীদের অতীত ও বর্তমান জীবনপদ্ধতি সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা। মূল কাহিনী অনুসরণ ও উপলব্ধির পক্ষে এইটুকু নিতান্তই অপরিহার্য।

ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে গারো পাহাড়। ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়। ঘন নীল গহন বন, অজস্র ঝরনা, নদী ও উপলে ঘেরা এই সীমান্ত প্রায় দুই লক্ষ আদিবাসীর শান্ত আবাসভূমি।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই গারো পাহাড়। এই পাহাড়ের পাদদেশে দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ এবং পূর্বে শ্রীহট্ট জেলার বিশর বিপাশা থানা হইতে পশ্চিমে রংপুর জেলা পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ শ্যামল সমতল অঞ্চল জুড়িয়া হাজং, ডালু বানাই, কোচ, হদি ক্ষত্রিয় ও গারো আদিবাসীদের বাস। এই জেলার চারিটি পরগণা— সুসং, সেরপুর, আলাপসিং ও জহরশাহী। এবং তিনটি মহকুমা—জামালপুর, সদর-উত্তর ও নেত্রকোণার মোট সাতটি থানা—সেরপুর, নালিতাবাড়ী, শ্রীবর্দি, নালিতাবাড়ী, হালুয়াঘাট, সুসং দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা এবং শ্রীহট্টের বিশর বিপাশা থানার সমভূমি হইতেছে আদিবাসী কৃষকদের আন্দোলন ও সংগ্রাম ক্ষেত্র।

ময়মনসিংহের এই পাহাড় সীমান্ত অঞ্চল পূর্ব বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শস্য ভাণ্ডার। শেরপুর, শম্ভুগঞ্জ, নালিতাবাড়ী, চন্দ্রকোণা, নখলা, হালুয়াঘাট, মুন্সিরহাট, কলসিন্দুর, শিবগঞ্জ, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, নাজিরপুর, তাহিরপুর প্রভৃতি ইহার প্রধান বন্দর ও গঞ্জ। এই সব বন্দর হইতে প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ মন উৎকৃষ্ট ধান, পাট, সরিষা, লঙ্কা, তুলা, কলা, কমলা, আনারস, আলু, কচু প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য এবং শাল (গজারী) কাঠ, বাঁশ, জ্বালানী-কাঠ প্রভৃতি বনজ সম্পদ সারা বাংলার বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইত।

কর্ণঝোরা, ভটপুর, ঝিনাইগাতী, বারোয়ামারী, নলী, হাতী পাগার, বাঘাইতলা, ফুলবাড়ী, ঘোষগাঁও, কামারখালি, লেঙ্গুরা, খাড়নৈ এবং পোড়াকাশিয়া, ডালু, বাঘমারা, শিববাড়ী, মহিষখলা প্রভৃতি হইতেছে এই অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রধান হাট-বাজার। এই সব হাট-বাজারেই প্রথম আমদানি হয় পাহাড়ের সব রকম কৃষিপণ্য সামগ্রী। তারপর আদিবাসীদের নিজস্ব বুলিতে টাকার মাধ্যমে অথবা লবণ, কেরোসিন, মোটা সূতা, শুকনা মাছ প্রভৃতির বিনিময়ে এইগুলি বিকিকিনি হইত। মাপজোক, ওজন, গুনতি এবং দরদস্তুর সবই হইত খুব সহজ ও সরল আদিম পদ্ধতিতে।

মালঝি, থলং, ভোগাই, নিতাই, সুমেশ্বরী, গণেশ্বরী, মহাদেব, দশ এবং কংস হইতেছে এই অঞ্চলের ছোটবড় নদী-উপনদী—এই সব দ্রব্য আমদানি রপ্তানির প্রধান জলপথ। দুর্গম গারো পাহাড় হইতে এই সব নদীর জলে ভাসাইয়া আনা হইত বিভিন্ন বনজ সম্পদ যেমন গজারী, তারাই, বাঁশ প্রভৃতি। ধানশাইল, কালীনগর, চুয়া, খুলিয়া, চিনাকুরী, প্রভৃতি প্রতিটি বিরাট বিরাট বিল ও হাওড় হইল এই অঞ্চলের জলাভূমি—মাছের জন্য বিখ্যাত। তাহা ছাড়া মাঝে মাঝে সামান্য ছোট ছোট বন জঙ্গল ও টিলা Hillock) বাদ দিলে সমস্ত অঞ্চলটাই হইল আবাদযোগ্য কৃষিভূমি।

সোমেশ্বরী নদী গারো পাহাড়ের কোনকুক শিখর হইতে প্রবাহিত হইয়া তুরা ও আরবেলা পর্বতশ্রেণীর জলধারা লইয়া সুসংএর সমভূমিকে সিঞ্চিত করিতেছে। আর নকরেক শিখর হইতে বাহির হইয়া দুবরান্দা গিরি, সান্দং, সোনা, চান্দাপাড়া, বান্দাপানী ও ভগী গিরির অসংখ্য ঝরনাধারা বুকে লইয়া—ভোগাই নদী প্রবাহিত হইয়াছে নালিতাবাড়ীর মধ্য দিয়া দক্ষিণের কংস নদী পর্যন্ত। প্রধানত এই সোমেশ্বরী ও ভোগাই নদী বিধৌত সমভূমিতেই হাজং, ডালু, বানাই, কোচ হদি, ও গারো উপজাতীয়দের বাস।

সমভূমির এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে হাজং সম্প্রদায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই স্বাভাবিকভাবেই সর্ববিষয়ে তাহাদের ভূমিকাই প্রধান।

হাজং

নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের দিক হইতে হাজংদের বলা যায় আদি মঙ্গোলীয় (Pale-Mongoloid) বা অষ্ট্রিক জাতীয়। ইহাদের দেহের রং পীতাভ, নাক চেপ্‌টা, চক্ষু গোল, মুখমণ্ডল শ্মশ্রু বিরল, শরীরের গঠন দৃঢ় ও মজবুত। ইহারা কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, নির্ভীক ও আনন্দপ্রিয়,—একান্তভাবে বিশ্বস্ত, সরল, বন্ধুবৎসল ও অতিথিপরায়ণ। শোনা যায় যে সুদূর অতীতে ইহারা বর্মা ও ইন্দোচীন হইতে আসাম প্রদেশের কামরূপ জেলার অন্তর্গত হাজো নগরে আসিয়া প্রথম বসতি স্থাপন করে। কথিত আছে যে হাজো নগরের ভাস্বর বর্মা নাকি হাজংদের পূর্বপুরুষ। পরবর্তীকালে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে এবং তাহার উপায় ও উপকরণের তাগিদে ইহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া আসামের গোয়াল পাড়া ও গারো হীলস জেলার অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে এবং রংপুর জেলার সামান্য অংশে ও সমগ্র উত্তর ময়মনসিংহের উর্বর ভূমিতে ছড়াইয়া পড়ে। হাজংদের এই সব ছোট ছোট দল নিজেদের প্রয়োজনীয় সাধারণ তৈজসপত্র, তীর, ধনুক, ঢাল, তলোয়ার, বল্লম, চেওয়ার প্রভৃতি নানা ধরনের সহস্তে তৈয়ারী লোহার অস্ত্রশস্ত্র এবং লাঙল জোয়াল, গরু, মহিষ প্রভৃতিসহ কিছুটা দূরে দূরে এক একটি পাড়া গড়িয়া তোলে ও বসবাস শুরু করে। নিজেদের সমবেত শক্তিতে ক্রমে তাহারা সুসং ও সেরপুর অঞ্চলের বহু স্থান অধিকার করিয়া বসে। সুজলা সুফলা ভূমি পাইয়া এই অঞ্চলের বিরাট বিরাট বন জঙ্গল কাটিয়া তাহারা আবাদযোগ্য ভূমিতে পরিণত করে।

রংপুরের কড়ই বাড়ী, পুঠিমাড়ী বারোহাজারী হইতে আরম্ভ করিয়া দশ কাহনিয়া, সেরপুর, সুসং দুর্গাপুর, বংশীকুণ্ডা, লাউর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন

স্থানে তাহারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। জনশ্রুতি আছে যে ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে জিঞ্জিরাম ও কালোনদী বিধৌত উর্বর ভূমিতে হাজং সর্দার কমলাকান্ত ও মহন্ত কুমার এক সময় একচ্ছত্র রাজা ছিলেন। হাজংদের এইসব বসতি স্থাপনের সময় কৃষিকাযে পশ্চাৎপদ গারোদের সঙ্গে তাহাদের ছোট ছোট সংঘর্ষ ঘটে। হাজংরা চাষ করিত হালের সাহায্যে আর গারোরা করিত "জুম"[•] চাষ। সংঘর্ষের ফলে গারোরা ক্রমে সমতলের জমি হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। কেবল জুম চাষের জমি রহিয়া গেল গারোদের দখলে।

হাজংদের নামাকরণ সম্বন্ধেও একাধিক মত বর্তমান। এক মতানুযায়ী হাজো নগর হইতে আগত বলিয়া তাহারা হাজং নামে পরিচিত। দ্বিতীয় মতে হাজংরা যেহেতু হাল চাষ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত এবং কৃষি-কাযে তাহাদের যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল তাই তাহাদের বলা হয় হাজং। কারণ গারো ভাষায় হাজং শব্দের আক্ষরিক অর্থ মাটির পোকা। "হাজং কুল প্রদীপ" নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে হাজংরা একটি জাতি—তাহারা ক্ষত্রিয়। (১) আবার ডাঃ ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন সাহেব তার ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দের রংপুর বিবরণীতে ইহাদের বাঙালী হিন্দু হওয়ার ঝোঁকের দিকেই জোর দিয়াছেন। (২) জাতিত্বের আধুনিক সংজ্ঞা অনুযায়ী অবশ্য হাজংদের একটি জাতি বলা চলে না, বলা যায় উপজাতীয় একটি শাখা সম্প্রদায়।

'জুম চাষ" :—পাহাড়ী টিলার (Hillock) বন জঙ্গল আগুনে পোড়ানোর পর বাঁশের কাঠির সাহায্যে মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া তাহাতে বীজ রোপন করা হয়। ইহা আদিম প্রথার চাষ।

(১) ভারত ভূখণ্ডের যে অংশে আমরা অবস্থান করিতেছি তাহাতে বহু শ্রেণীর হিন্দু ও অহিন্দু বসতি করেন। তন্মধ্যে হাজং একটি গণনীয় ও বরেণ্য জাতি। এই জাতি বাংলা ও আসামের কিয়দংশ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে ইহারা ক্ষত্রিয়। ("হাজং কুল প্রদীপ")।

(২) **"Near Linggimari are perhaps sixty families of Hajong who are the original inhabitants of the adjoinining territory of Koroyivari, and whose**

হাজংরা দুইদল বা দুই মতবাদে বিভক্ত—শাক্ত ও ভক্ত (বৈষ্ণব)। শাক্ত মতবাদী হাজংরা প্রধানত কালী ও কামাখ্যা দেবীর উপাসক। নিজেদের তৈয়ারী মদ, ছাগ, মেষ, হরিণ ও বন্য শূকরের মাংস ইহাদের প্রিয় খাদ্য। শাক্ত হাজংরা দুর্দান্ত, দক্ষ শিকারী। ভক্ত (বৈষ্ণব) হাজংরা মদ, মাংস স্পর্শ করে না। তাহারা মাছ খায় বটে তবে দুধ, দৈ, ছানা মাখন তাহাদের প্রিয়। ভাং সিদ্ধি তাহাদের প্রধান নেশা, আতপ চাল ও খেসারীর ডাল সব হাজংএরই দৈনন্দিন প্রধান খাদ্য। "খার পানি" "লেবা হাগ" অর্থাৎ সোডা বা নিজেদের তৈয়ারী খার ও আতপ চাউলের গুড়া অর্থাৎ পিঠুলী সহযোগে রান্না করা যে কোন ব্যঞ্জন এমনকি মাছও ইহারা খুব পছন্দ করে। তেল ঘির পরিবর্তে এই খারপানি ও লেবা ব্যবহার করা হয়। কাছিমের মাংস ও শুকনা মাছ (হিদল) হাজংদের নিকট অতি উপাদেয় খাদ্য। তাহাদের আর একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য "বিচি" ভাত। বিন্নি ধানের আতপ চাউল বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বাষ্পের সাহায্যে সিদ্ধ করিয়া ইহা রান্না করা হয়। সম্পূর্ণ কাঁচা বাঁশের চোঙে ভরিয়া ঈষৎ জলের সাহায্যে বাঁশের চোঙাগুলি আগুনে পোড়াইয়াও বিচি ভাত রান্না করা যায়। এই ভাত যত্ন করিয়া রাখিলে সাত

chief was latley its proprietor. Their number being very small, I shall pass them over by saying that in this district at last they have adopted entirely the language of Bengal but continue to delight in all the impurities of the Parti Rabhas. The chief, however, whose ancestors had long possessed the territory pretended to be a Rajbonsi and observed some sorts of decency. He neither eats pork nor fowls nor does he publicly drink strong liqurs and receives instruction (Upodes) from a Brahman. His estate was lately purchased in the name of Raja of Vihar."

(*From Dr. Francis Buchanan-Hamiltio's Account of the district of Rangpur* **1010**)

আট দিন পর্যন্ত কোন রকম পচন ধরে না—নষ্ট হয় না। ইহা অদ্ভুত ধরনের সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য। দূরের পথযাত্রায় এই খাদ্য বিশেষ ভাবে সহায়ক।

দৈ, চিড়া, বিচি-ভাত

খার পানি, লেবা হাগ,

কাছিম-মাসাং

হিদল-মাছ

গুষ্টি বাড়ীর বুক্নী ভাত।*

এই আটটি হইতেছে হাজংদের প্রিয় খাদ্য।

হাজংরা প্রধাণত নিজেদের তাঁতে বোনা কাপড়ই ব্যবহার করে। পুরুষেরা পরে ৫×২ হাত গামছা এবং ৩×২ হাত একটি গামছা কাঁধে রাখে। মেয়েরা নিজেদের "বানায়" গড়া হাতের তাঁতে তৈয়ারী পাতিন ও আগন পরে। "পাতিন" সাধারণত ৫×৩॥ হাত বিভিন্ন রকমের হয়। নানা রং মেশানো ও কারুকার্যখচিত এই পাতিন মেয়েরা পরে বাহুদ্বয়কে মুক্ত রাখিয়া বক্ষের উপর হইতে হাটুর নীচ পর্যন্ত। আর আগন অনেকটা ওড়নার কাজ করে, বাহুদ্বয় ও কাঁধের উপর হালকা ভাবে জড়াইয়া থাকে। হাজং মেয়েরা কখনও মাথায় ঘোমটা দেয় না। অবগুণ্ঠনকে তাহারা ঘৃণা করে। বিচিত্র কেশবিন্যাস ও বিভিন্ন ছাদে খোঁপা বাধার ব্যাপারে ইহাদের একটু বিলাসীই বলা চলে। মাঠের কাজে বা বনে জ্বালানি কাটিতে গেলেও হাজং মেয়েরা কেশবিন্যাস ভোলে না। তাহা ছাড়া গলায় মালা, কানে কানফুল, হাতে পিতলের বালা এবং মনিবন্ধ হইতে প্রায় কনুই পর্যন্ত যতগুলি সম্ভব মোটা মোটা শাঁখা পরিতে তাহারা ভালবাসে। বিধবা মেয়েরা রঙিন কাপড় ও শাঁখা ব্যবহার করিতে পারে না। সমাজের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই হাজং মেয়েদের পুরুষের

*বুক্নীভাত এক প্রকার সুমিষ্ট ভাত। ধান গাজাইয়া চাউল করিয়া Yeast form করিলে এই ভাত হয় অথচ ইহা কোন নেশা বা মদ নয়।

সমান অধিকার ও মর্যাদা স্বীকৃত। যেমন সম্পত্তিভোগের ক্ষেত্রে তেমনই দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত রকম গৃহস্থালী কাজকর্ম ও কৃষিকাজেও।

হাজংদের মধ্যে বিবাহ ব্যবস্থা খুবই সহজ ও স্বাভাবিক। একমাত্র নিকট আত্মীয় ছাড়া যে কোন বয়সের যে কোন মেয়ে পুরুষ জীবনে একাধিকবার বিবাহ করতে পারে এবং উভয়ে ইচ্ছা করিলে যে কোন কারণে বিবাহ বিচ্ছেদও করিতে পারে। সাধারণত ইহাদের মধ্যে এক সাথে এক স্ত্রীর বেশী দেখা যায় না। বিধবাবিবাহ সমাজে সহজভাবে গৃহীত ও প্রচলিত। অবাধ চলাফেরা ও মেলামেশার ফলে মেয়ে পুরুষ পরস্পরের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া বিবাহ করলে তাহাকে বলে "দায়পড়া" বা "দায়মারা" বিবাহ। এই দায়-পড়া বিবাহের পূর্বে আত্মীয় স্বজন বা সমাজের কাহারো কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। প্রেমিক প্রেমিকা দুই জনই যে কোন উপায়ে এক বা একাধিক রাত্রি "মধুচন্দ্রিকা" যাপন করতে পারিলেই এই দায়পড়া বিবাহ সিদ্ধ হয়। ইহা আমাদের শাস্ত্রোক্ত গান্ধর্ব বিবাহেরই রকম ফের। অবশ্য এই বিবাহের জন্য পরে গ্রামবাসীদের একটা ভোজ দিতে হয়। হাজংদের আনুষ্ঠানিক বিবাহের মতো ইহা মোটেই ব্যয়বহুল নয়। তাই খুব সহজেই ইহা সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। পাত্র-কন্যা নির্বাচন পূর্বক অনুষ্ঠানিক বিবাহ বেশ ব্যয় সাধ্য। ইহা করিতে যাইয়া অনেক হাজং চাষীকে নিজের জমি জমা ও হাল-বলদ মহাজনদের নিকট হারাইতে হয়। এই আনুষ্ঠানিক বিবাহ পুরোহিত ছাড়াও হয়; পাত্র পাত্রী উভয় পক্ষের জানা শোনা যে কোন মোড়ল অথবা সমাজের সম্মানিত দম্পতিকে উভয় পক্ষে "ধনী মা" ও "ধনী বাপ" ঠিক করা হয়। এই ধনী মা বাপ (ধর্মের মা বাবা) বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট রাত্রে প্রচুর ধূপ দীপ আলো জ্বালাইয়া অগ্নি ও উপস্থিত নিমন্ত্রিতদের সাক্ষ্য রাখিয়া বর কনেকে কার্পাস তুলা ধান-দুর্বা ও কিছু নগদ টাকা দিয়া আশীর্বাদ করেন। পরে সমবেত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণও আশীর্বাদ করেন। এই আশীর্বাদের পালা শেষ হইলেই বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। ধনী মা বাপকে অবশ্য একটা

মোটা টাকা লৌকিকতা বাবদ খরচ করিতে হয়। হাজংদের এই আনুষ্ঠানিক বিবাহ উৎসব চার পাঁচ দিন পর্যন্ত চলে। এই উৎসবের যদৃচ্ছ ব্যয়ের পরিণামে নবদম্পতিকে পরবর্তী জীবনে অনেক সময় এক করুণ অর্থনৈতিক সংকটে পড়িতে হয়।

হাজংদের সমাজে অনুষ্ঠানে কোন প্রকার বিগ্রহ বা প্রতিমা পূজা করিতে দেখা যায় না। ভক্তেরা গলায় কণ্ঠি ধারণ করেন—ফোঁটা তিলক কাটেন ও মাথায় শিখা রাখেন এবং নিজেদের বাড়িতে একটি ছোট ঘরে বসিয়া উপাস্য দেবতার উদ্দেশ্যে জপতপ করেন। শাক্তরা গ্রামের মধ্যে বা গ্রামের উপকণ্ঠে যে কোন অশ্বত্থ, শিমুল বা শেওড়া গাছের তলায় ছোট ছোট মাটির বেদী রচনা করিয়া অথবা ছোট একটি কুড়ে ঘর তৈয়ারী করিয়া উহাতে সামান্য একটু মাটির ঢিপির মত গড়িয়া নিজেদের উপাস্য দেবতা কালী কামাখ্যার পূজা করেন। ধর্মের দিক হইতে হাজংদের জড়োপাসক মনে হইলেও বাঙালী হিন্দু ধর্ম এবং হাজংদের জড়োপাসনার মধ্যে কোন সীমারেখা টানা যায় না। এই সব পূজা অর্চনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হাজংরা নিজেরাই করেন। যিনি এই পূজা অর্চনা ও বলিদান করেন তাহাকে "দেউসী" (দেবর্ষি) বলা হয়।

গ্রামবাসীরা নিজেদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সৎচরিত্র সাত্ত্বিক ও নিষ্ঠাবান-ব্যক্তিকে এই দেউসী পদে নির্বাচন করেন। ঘোষগাও, মোজাখালি, নালিতাবাড়ী, চরণতলা প্রভৃতি কালী কামাখ্যা মন্দিরে দেউসীরাই পূজারী এবং সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ই তাহাদের পূজায় অংশ গ্রহণ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে। হাজংদের মধ্যে আবার "পুরোহিত" ও "অনাপুরোহিত" বলিয়া দুইটি ভাগ আছে। পুরোহিত দল শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদ্বারা পূজা পার্বন ক্রিয়া কাণ্ড করানোর পক্ষপাতী। অনাপুরোহিতরা দেউসীপ্রথার সমর্থক। হাজংদের অন্যান্য আনন্দ উৎসব ও পর্ব হিসাবে বর্ষায় শ্রাবণী ব্রত, (মনসা পূজা) শরতে নয়াখাওয়া (নবান্ন উৎসব) শীতে চোরমাগা, (পৌষপার্বন) বসন্তে গ্রামপূজা (বাস্তু পূজা) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নবান্ন ও বাস্তু পূজায় অফুরন্ত পানভোজন

চলে। শীত কালে নিজেদের লোকনৃত্য ও লোক সঙ্গীতের অনুষ্ঠান হয়।

এই আদিবাসী সমাজে মুখ্যত ইন্দোমঙ্গোলয়েড জাতি সংস্কৃতির ছাপই প্রধান। "লেওয়া টানা," "জাখা মারা," "অষ্টসখি সিপাহীগান প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের বা আঙ্গিকের পল্লীগীতি পল্লীগাথা, নৃত্য, ছড়া, পাঁচালী প্রেমপূর্ণ রোমাঞ্চকর গল্প কাহিনী ছাড়াও ধর্মমঙ্গল কীর্তন, টপ্পা, কবিয়ালদের পালাগান প্রভৃতি সমগ্র অঞ্চলের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সম্পদ। পূর্ববঙ্গ গীতিকা, মৈমনসিংহ গীতিকার বিখ্যাত গীতিনাট্য মহুয়া, রাণী কমলা ও আঁধা বধূ এই অঞ্চলের বাস্তব বিষয়বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত ও রচিত। "হাজংদিগের আবাসভূমি হইতেই মৈমনসিংহ গীতিকার অভিনয় ক্ষেত্র আরম্ভ হইয়া তাহা দক্ষিণদিকে মেঘনা নদীর তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে"। আধুনিক যুগের হাজং সম্প্রদায়ের কবিয়াল চন্দ্র সরকার, কীর্তনীয়া নন্দ নাথ, পল্লীগীতিকার মকরন্দ ও গায়ক ধনেশ্বরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাজংদের ভাষা বাংলা, বাংলা বর্ণমালা ও লিপি তাহাদেরও লিপি। এমন কি আসামের যে সকল স্থানে হাজংরা বসবাস করিতেছেন তাহাদের ভাষা ও লিপিও বাংলা, তবে আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় কিছু কিছু প্রাচীন শব্দ ও উপজাতীয় ভাষার প্রভাব রহিয়াছে।

যেমন জল=পানি, আগুন=জুই, ভূমি=ভূই, নদী=গাং, আমি=ময় তুমি=তয়, পুরুষ=মরদ, স্ত্রী=তিমাং সাধারণ শিক্ষায় সংখ্যাগত হিসাবে হাজংরা পশ্চাৎপদ হইলেও শিক্ষার প্রতি তাহাদের প্রচুর আগ্রহ রহিয়াছে। বর্ণপরিচয় আছে ও নাম স্বাক্ষর করিতে পারে এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। বর্তমানে বেশ কিছু সংখ্যক হাজং যুবক ইংরেজী উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া সরকারী, বেসরকারী চাকুরী, স্কুলে শিক্ষকতা এবং চেতনাসম্পন্ন রাজনৈতিক জীবনযাপন করিতেছেন। এই নব-শিক্ষিত সম্প্রদায় আচার ব্যবহার শিক্ষা দীক্ষা ও চিন্তা ভাবনার দিক হইতে খাঁটি বাঙালী এবং স্ব সম্প্রদায়কে সেই আদর্শে গড়িয়া তোলার জন্য উদ্যোগী। বর্তমান যুগে

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে হাজং সম্প্রদায় বাংলার সমাজ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বহু উত্থানপতন ও অনুকুল প্রতিকুল অবস্থার মধ্য দিয়া সুদীর্ঘকাল সংগ্রামী জীবন যাপন করার ফলে আজ হাজংদের সমাজচেতনা অনেকটা বিকাশ লাভ করিয়াছে—সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। বাংলার আদিবাসী নামক পুস্তকে শ্রীসুবোধ ঘোষ লিখিয়াছেন :—"বাংলা দেশে এমন কয়েকটি সমাজ আছে যাহারা কোনকালে গোষ্ঠীবদ্ধ আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজে ছিল, কিন্তু বর্তমানে তাদের মধ্যে উপজাতীয়ত্ব এবং গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের কোন নিদর্শন নাই এবং তারা ধর্মে ভাষায় ও সামাজিক আচারে হিন্দু হয়ে গেছে। সুতরাং নতত্ত্বের দিক দিয়ে এরা আদিবাসী হলেও আজ এরা হিন্দু।" হাজংদের সম্বন্ধেও এই উক্তি অনেকখানি সত্য। ইহাদের উপজাতীয় চরিত্র একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া না গেলেও হিন্দুত্ব ও বাঙালীত্বের দিকে ইহারা অনেক দূর অগ্রসর। মোটামুটি ভাবে আজ ইহাদের বলা চলে বাঙালী হিন্দু।

ডালু

ডালুরাও ইন্দোমঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর একটি শাখা। ব্রহ্ম ও ইন্দোচীন হইতে তাহারাও আসামের পথে এই ময়মনসিংহ পাহাড় সীমান্তে আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ডালুরা দাবি করে যে তাহারা মহাভারতে বর্ণিত অর্জুন পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর। মণিপুরী ক্ষত্রিয় বলিয়া তাহারা নিজেদের পরিচয় দেয়। কিংবদন্তী আছে যে কোন এক সময় সুবল সিং নামে জনৈক মণিপুরী সর্দার স্বীয় দলবলসহ প্রাগজ্যোতিষপুর হইতে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীর ধরিয়া গারো পাহাড়ের দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া পূর্ব বঙ্গ ও আসামের মিলনস্থল বাবেলাপাড়ার সমতল ভূমিতে —ভোগাই নদীর তীরে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। ইহাই বর্তমানে ডালু বিল্লা ও ডালু নাও নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে উত্তরে হাড়ি গাও হইতে দক্ষিণে হাতী পানার, কুমারগাতী সংগ্রা, যুগলী প্রভৃতি ও কংস নদী পর্যন্ত তাহাদের গ্রাম গড়িয়া উঠে। হাজংদের তুলনায় তাহাদের জনসংখ্যা অনেক কম। তাই স্বভাবতই সীমাবদ্ধ স্থানেই তাহাদের বসবাস। ডালুদের বেশভূষা আচার ব্যবহার রীতিনীতি, সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানাদি প্রায় সমস্ত কিছুই হাজংদের অনুরূপ। তাই এই অঞ্চলের আদিবাসীদের বিশ্বাস যে ইহারা হাজংদেরই একটি অংশ। অনেকের বিশ্বাস যে স্থানীয় গারো ও হাজংদের সংমিশ্রণেই ডালুদের উদ্ভব, এবং হাজং গারো উভয় কুল হইতেই ভ্রষ্ট হইয়া তাহারা ডালু নামে পরিচিত হইয়াছে। পাগল বিদ্রোহের নায়ক বিখ্যাত টিপু পাগলা এই ডালুদের পূর্ব পুরুষ বলিয়া অনেকের ধারণা। এখনও ডালুদের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক পাগল-

পন্থী দেখা যায়। এই পাগলপন্থীরা পৌত্তলিকতা বিরোধী এবং একেশ্বর-বাদী। পাগলপন্থী ডালুরা মাথায় জটা বা বড় বড় চুল ও দাড়ি-গোঁফ রাখেন। গলায় মোটা সাদা কালো নীল রংএর পুঁতির মালা পরেন। মেয়েরা শাঁখা সিন্দুর ব্যবহার করে না। ইহারা বিখ্যাত মীরের অনুগামী বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। হিন্দু ধর্মীয় ডালুরা শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা-অর্চনার কাজ করায়। ১৯৪১ সনের আদমসুমারী হইতে ডালুদের অনুন্নত তপশীল-ভুক্ত জাতি (scheduled caste) বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

বানাই

বানাইরাও ডালুদের মতোই হাজং সম্প্রদায়ের অংশ,—তাহাদেরই গোষ্ঠী-ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। তাহাদের জন্ম মৃত্যু, বিবাহাদি সংক্রান্ত যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড হাজংদের মতোই। বানাইদের জনসংখ্যা খুবই কম। পূর্ব কমলাকান্দা থানার গৌরীপুর হইতে গলইভাঙা, গাবরাখালি, আয়লাতলি, জামপড়া পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রামে বানাইদের বসতি রহিয়াছে। তাহাদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকর্ম। কিন্তু দুধ দৈ প্রভৃতির ব্যবসা করিতেও তাহাদের দেখা যায়। ১৯৪১ সনের আদম সুমারী হইতে তাহাদের অনুন্নত তপশীলভুক্ত জাতি বলিয়া গণ্য করা হয়।

কোচ

হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ "যোগিনীতন্ত্রে" কোচ জাতির বর্ণনা রহিয়াছে, বিশ্বকোষ পুস্তকেও ইহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্ত্যজ জাতি বলিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে যে উল্লেখ রহিয়াছে তাহাতেও কোচ জাতির নাম পাওয়া যায়। তাই কোচরা যে একটি বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে একটি সুপ্রাচীন জাতি তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আসামের কামরূপ, গোয়ালপাড়া জেলা এবং উত্তর বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের সমগ্র উত্তর সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে কোচদের বসতি রহিয়াছে। ইহারা ইন্দোমঙ্গোলয়েড জাতিরই "বোড়ো" নামক এক শাখা। "পূর্ব মৈমনসিং অঞ্চলে মধ্যযুগ পর্যন্ত এই বোড়ো জাতিরই এক শাখাভুক্ত জাতির বসবাস ছিল, তাহারা কোচ নামে পরিচিত। ইন্দোমঙ্গোলয়েড জাতির এই সকল শাখা প্রবল মাতৃতান্ত্রিক।*

গারো পাহাড়ের পশ্চিম পাদদেশ হইতে প্রবাহিত মালঝী নদীর পারে কোচনীপাড়া, তাওকুচা, ভুধনই হইতে শুরু করিয়া রাংটিয়া চান্দভুঁই, কড়ইতলা গোবরাকুড়া পর্যন্ত ৫০।৬০টি গ্রামে কোচদের বসতি রহিয়াছে।

সামাজিক রীতিনীতি আচার ব্যবহার এবং অনুষ্ঠানাদির ব্যাপারে ইহারা এখনো রক্ষণশীল। বর্তমানে বাংলা ভাষা ও লিপি গ্রহণ করিলেও নিজেদের কথ্য ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা, প্রতিবেশী গারো বা হাজংদের কথ্য ভাষার সঙ্গেও কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। যথা—আমি=আং, তুমি=নাং, জল=টিকা, মাটি=হা, বাতাস=নাংপার, আগুন=ওয়ার, সূর্য=রাশেন, যাওয়া=লাইতো, ভাত, চাউল, ধান=মায়, মাছ=না, মাংস=কান ইত্যাদি। বেশভূষা অনেকটা

---

* বাংলার লোক সাহিত্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

হাজংদের মতো। পুরুষেরা গামছা ও মেয়েরা পাতিল ও আগন ব্যবহার করে। মেয়েরা হাতে গলায় মোটা মোটা দস্তার বালা ও হাসুলী, কানে তেমনই দস্তার ভারি কানফুল বা কানবালা পরে। মুখমণ্ডলে, হাতে, বাহুতে ও বক্ষে উল্কি দেয়; হাতের আট আঙুলেই দস্তার আংটি পরিতে ভালবাসে। খাদ্যের ব্যাপারে গো মাংস ছাড়া প্রায় সবই তাহাদের ভক্ষ্য। নিজেদের তৈয়ারী মদ ও তামাক তাহাদের প্রধান নেশা। ইহাদের দৈহিক গঠন দৃঢ়। খালি হাতে বা সামান্য লাঠির সাহায্যে তাহারা বাঘ, ভালুক ও বন্য শুকর তাড়াইতে পারে। বল্লম, চেওয়াড়ের সাহায্যে তাহারা বড় বড় হিংস্র জন্তু শিকার করিয়া থাকে।

কোচদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ প্রভৃতি উৎসব ও অনুষ্ঠান নিতান্ত স্বাভাবিক ও সাধারণভাবে হইয়া থাকে। তাহাদের পরস্পরের বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসা নিজেদের সমাজেই হইয়া থাকে, কোন সরকারী আদালত বা বিচারালয়ের সম্মুখীন তাহারা সাধারণত হয় না।

কোচ গণ "ঋষি ও জগ" এই দুই দেবদেবীর উপাসক। ঋষি ও জগ বলিতে শিব-দুর্গা বা হর-পার্বতীকে বুঝায়। এই দেবদেবীর কোন মূর্তি তাহারা গড়ে না। উপাস্য দেবতার উদ্দেশ্যে ছাগ, মহিষ, পায়রা, হাস, মুরগী ও কাছিম বলি দিয়া সেই রক্ত ছড়াইয়া দেয়। এই সব পূজা অর্চনা নিজ সম্প্রদায়ের দেউসীরাই করিয়া থাকেন। কঠিন রোগের হাত হইতে মুক্তির জন্য তাহারা প্রেতের উদ্দেশে, "বিধান" অর্থাৎ পূজা দেয়,—ঝাড়, ফুক-মন্ত্রে বিশ্বাস করে। এই কোচ জাতি আসাম ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ায় তাহাদের বিকাশেও প্রচুর বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। মূলত ভৌগলিক পরিবেশের পার্থক্যের দরুণই তাহাদের জীবন জীবিকায় ও সামাজিক অগ্রগতিতে এই বিভিন্নতার সৃষ্টি হইয়াছে। এই অঞ্চলের কোচরা বর্তমানে রক্ষণশীলতা বর্জন করিয়া প্রতিবেশী হাজং, ডালু ও বানাইদের অনুসরণ করিতেছে।

হদি-ক্ষত্রিয়

উত্তর ময়মনসিংহের আদিবাসীদের মধ্যে হদি বা হৈহয় ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দুধর্মের ছত্রছায়ায় থাকা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ কাল যাবৎ ইহাদের অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা ও নানা ধরনের নির্যাতন চলিয়া আসিয়াছে। অথচ এই হদি ক্ষত্রিয়দের দৈহিক শক্তি বীর্যবত্তার উপর নির্ভর করিয়াই এই অঞ্চলের বর্ণহিন্দুগণ অন্য ধর্মের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে। এই কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে এই হদি ক্ষত্রিয়দের সংঘবদ্ধ ক্ষাত্রশক্তির বলেই এই অঞ্চলের বর্ণহিন্দু ভূস্বামীগণ পুরুষানুক্রমে বিষয়-সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেন। সেরপুর পরগনার জমিদার শ্রেণীর প্রধান সামরিক শক্তিই ছিল এই হদি সম্প্রদায়।

এই হদি ক্ষত্রিয়গণও আসলে ইন্দোমঙ্গোলয়েড নরগোষ্ঠীর (সহিত সম্পর্কিত) একটি শাখা সম্প্রদায়। তাহারা নিজেদের ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণ বর্ণিত সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা হৈহয় এর বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। জীবনের তাগিদে হদিগণ কৃষিকাজ করিতে বাধ্য হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহাদের কাজ ও চরিত্রে ক্ষত্রিয়সুলভ বৈশিষ্ট্যই খুব স্পষ্ট। হিন্দু সমাজ ও হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে যে কোন রকম আক্রমণের সম্মুখে তাহারা মরণপণ সংগ্রাম করেন। মল্লযুদ্ধ, লাঠিখেলা, বর্শাবল্লম, জাঠা চালনা ও রামদা ব্যবহারে তাহাদের সমকক্ষ অপর কোন সম্প্রদায়কে দেখা যায় না। কৃষিজীবী হইলেও হদি ক্ষত্রিয়গণ কৃষিকাজে তেমন দক্ষ নয়। গ্রাম্য হাট বাজারে ব্যবসা বাণিজ্য ও বাঁশ বেতসের জিনিস তৈয়ার করা—গৃহস্থালির কাজকর্ম এবং জমিদারদের পাইক পেয়াদা, বরকনদাজ পাহারদার ও লাঠিয়ালের কাজ প্রভৃতি



ললিত সরকার (লেঙ্গুরা)



শহীদ সুমন্ত

বর্তমানে ইহাদের অন্যতম উপজীবিকা। তাহাদের দৈহিক গঠন দৃঢ় ও মজবুত, মানসিক শক্তি প্রবল এবং নিজ সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধতা আদর্শস্থানীয়।

এই হাদি ক্ষত্রিয় সমাজ হিন্দু সমাজপতি ও জমিদারদের নিকট দীর্ঘদিন বহু আবেদন নিবেদন করিয়াও সামান্য জলচল বলিয়া গণ্য হইবার ও ধোপা নাপিত ব্যবহারের অধিকারটুকু পায় নাই। হিন্দু সমাজের সমস্ত রকম অপমান-উপেক্ষা ইহাদের উপর বর্ষিত হইয়াছে।

এই জেলার উত্তর দিকে কালীনগর, নালিতাবাড়ী হালুয়াঘাট হইতে দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত ইহাদের বসতি রহিয়াছে। ১৮২১ সনের কৃষি-বিদ্রোহের নায়ক জানকু পাথর ও দুবরাজ পাথর ইহাদের পূর্বপুরুষ।

গারো

ভারতের আদিবাসীদের মধ্যে গারো সম্প্রদায় বিশেষ পরিচিত। ইহারা গারো পাহাড়ের আদিম অধিবাসী। ইহাদের সমাজব্যবস্থা এখনো পুরাপুরি মাতৃতান্ত্রিক। সাধারণত গারোদের ব্যবহার খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ ও প্রীতিকর, তাহারা সরল, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী ও শান্ত প্রকৃতির। "জুম" চাষ আবাদই গারোদের প্রধান উপজীবিকা।

গারো পাহাড়ের গারোদের সঙ্গে এই সমতল অঞ্চলের গারোদের মৌলিক কোন পার্থক্য না থাকিলেও চাষ আবাদ শিক্ষা দীক্ষায় বাংলার গারো সম্প্রদায় অনেক দূর অগ্রসর। গারোরা প্রধানত "আচিক্", "আতক্" ও "আবেং" এই তিন গোষ্ঠীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে আবার দুই ধর্মাবলম্বী লোক রহিয়াছে :—খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান বা সংসারী।

১। খ্রীষ্টানরা বিভিন্ন চার্চের আশ্রয়ে রহিয়াছে। শিক্ষা আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারে ইহারা কিছুটা অগ্রসর বটে। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ইহারা অজ্ঞ ও বিমুখ।

২। সংসারী গারোরা পূর্বপুরুষের রীতিনীতি আচার ব্যবহার, ও ধর্ম বিশ্বাস মানিয়া চলে। হিন্দু ধর্মের প্রতিও তাহারা অনুরক্ত ও আগ্রহশীল। সংসারী গারোরা প্রকৃতপক্ষে জড়োপাসক। ইহারা বাঁশের গায়ে নানা ধরনের চিত্র বা রেখা আঁকিয়া সাদা, কালো, সবুজ প্রভৃতি রং এর নিশান উড়াইয়া "পাবন" (পার্বন) করিয়া থাকে। প্রায় সব ঋতুতেই কোন না কোন "পাবন" অনুষ্ঠিত হয়। তখন পানভোজন চলে ও সেই সঙ্গে ঢাক ঢোল কাঁসর

বাজাইয়া নানা ধরনের নৃত্য গীতও হয়। একই পরিবারে খ্রীষ্টান, সংসারী ও হিন্দু মতালম্বী গারোদের স্বচ্ছন্দে বসবাস করিতে দেখা যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের অভিযান ও হিন্দুধর্মের সংস্কারকদের প্রচার আন্দোলন এই সম্প্রদায়ের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাই এই অঞ্চলের সমস্ত আদিবাসী জনতার জীবনেই এক পরিবর্তন দেখা যায়। প্রায় সকলেই জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

এই অঞ্চলের আদিবাসীরা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে অভিন্ন ও পরস্পর নির্ভরশীল।

এই আদিবাসীদের নিকটতম প্রতিবেশী হইতেছে রাজবংশী, ঝালো ও মুসলমান কৃষকগণ। রাজবংশী কৃষক সম্প্রদায় বাংলাদেশে সুপরিচিত। সেরপুর পরগণার নাচনমৌরী, ভটপুর, কান্দুলী, ঘোনাপাড়া প্রভৃতি গ্রামে ইহাদের বসতি রহিয়াছে। পরবর্তীকালে এই অঞ্চলের "ভাওয়ালী" প্রথার বিরুদ্ধে রাজবংশী কৃষকদের আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহারা আদিবাসীদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রতিবেশী।

নিলখিয়া, যোগানিয়া, মরিচপুরান, কাপাশিয়া, চন্দ্রকোনা প্রভৃতি গ্রামের ঝালো সম্প্রদায় এই অঞ্চলের কৃষিবিদ্রোহের সাথী।

সাধারণভাবে এই জেলার সমস্ত গরিব মুসলমান চাষী এই অঞ্চলের আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় মিশন

এই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল খ্রীষ্টীয় চার্চ ও মিশনারীদের ভূমিকা। এই সমগ্র অঞ্চলে রোমান ক্যাথলিক, অষ্ট্রেলীয় ব্যাপটিস্ট ও ভারতীয় খ্রীষ্টান (অক্সফোর্ড শাখা) এই তিন সম্প্রদায়ের চার্চ এবং তৎসংলগ্ন স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় ও চাষের জমি রহিয়াছে। সুসং পরগণার রানীকং, হালুয়াঘাটের বিরুইডাকিনী, নালিতাবাড়ী বারোয়ামারী বাঐবাদা হইতেছে রোমান ক্যাথলিকদের প্রধান কেন্দ্র। বিরিশিরি হইতেছে অস্ট্রেলীয় মিশনারীদের ঘাঁটি, আর হালুয়াঘাটের সেণ্ট এণ্ডরুজ চার্চ হইল ভারতীয় খ্রীষ্টান মিশনারীদের অন্যতম কেন্দ্র। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের কথা বাদ দিলে খুব স্পষ্ট ভাষাতেই বলিতে পারা যায় যে এই সব মিশনের পাদ্রীরা ধর্মপ্রচার ও আর্ত মানবতার সেবার নামে গভীর ও ব্যাপকভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সযত্নে ও সচেতনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিল এক প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি। খুব স্থূল ভাবেও দেখা গিয়াছে যে এই সব বিদেশী মিশনারী পাদ্রীরা প্রত্যেকটি গীর্জায় প্রচুর পরিমাণে বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্য (যথা—কাপড়, জামা, কম্বল, প্রসাধন দ্রব্য, কাগজ, কলম, পেনসিল, পুঁথি-পুস্তক, ঔষধ পথ্য, ছোট খাট যন্ত্রপাতি) আমদানি করিয়া বিক্রয় বা বিতরণ করিত এবং তাহার মাধ্যমে ভারতীয় দ্রব্যের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির অপকৌশল গ্রহণ করিত। এই সব পাদ্রীরা ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন হইতে আদিবাসীদের দূরে সরাইয়া রাখার জন্য সর্বদা সর্বরকমে চেষ্টা করিত। তাহারা আদিবাসীদের মধ্যে বিভেদ ও সংঘর্ষ সৃষ্টির জন্য চক্রান্ত করিত। এমনকি ভারতের মহান জাতীয় নেতাদের

প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিত। এই সব প্রতিক্রিয়াশীল কাজকর্ম ও মনোভাব থাকা সত্ত্বেও এই অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা, সাধারণ স্বাস্থ্য ও জ্ঞান বিস্তারে তাহাদের দান অনস্বীকার্য।

কোন প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা ও কর্মই সুদীর্ঘকালের জন্য দেশপ্রেমের উন্মেষ ও অগ্রগতিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে না,—দেশপ্রেমের মৃত্যু নাই। মানুষের জন্ম ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার জন্মভূমি ও পরিবেশের মধ্যে এই দেশপ্রেমের বীজ উপ্ত হয়,—প্রতিকূল পরিবেশে তাহা ব্যাহত হইলেও অনুকূল পরিবেশে অতি দ্রুত পুষ্টিলাভ করে। জাতীয় ঐতিহ্য মানুষের মনপ্রাণ ও দেহের উপর যে অদৃশ্য প্রভাব বিস্তার করে তাহা বাহির হইতে আমদানি করা কোন অন্ধ মতবাদ বা প্রতিক্রিয়াশীল কর্মধারাই সুদীর্ঘকাল প্রতিহত করিতে অক্ষম। বৃহত্তম জাতীয় পরিবেশ ও ভাবধারা হইতে মুক্ত থাকা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমরা দেখি খ্রীষ্টান মিশনারীদের শত অপপ্রচার ও অপকৌশল সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এই অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসী সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে এক বিরাট সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণ-আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে আদিবাসীদের চিন্তাধারা আর নিতান্ত সংকীর্ণ গোষ্ঠীপ্রীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই। তাহাদের মধ্যে জাতিপ্রীতির বৃহত্তম সংস্কার ও চেতনা দেখা দিয়াছে। তাহারা সর্বভারতীয় সমাজের সঙ্গে মহান এক জাতীয়ত্ব লাভ করার জন্য প্রস্তুত।

সামন্ততন্ত্রের গোড়াপত্তন

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত কোচ, হাজং, গারো সর্দারগণ এই সীমান্ত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে রাজত্ব করিতেন। ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে দালপা নামে জনৈক কোচ রাজা সেরপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাহার রাজধানী ছিল গড়দলিপা (বর্তমান গড়জরিপাড়) নামক স্থানে। দ্বিতীয় ফিরোজ শাহ বাংলার সিংহাসন অধিকার করিয়া সেনাপতি মজলিস খাঁ হুমায়ুনের সাহায্যে দলিপাকে নিহত করেন এবং সমগ্র সেরপুর অঞ্চল সর্বপ্রথম মুসলমান রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করেন। গড়দলিপা বর্তমানে গড়জরিপার নামে পরিচিত। ইহা সেরপুরের উত্তর পশ্চিমে সাত মাইল দূরে ১১ শত একর জমির উপর অবস্থিত। এই গড় (বা দুর্গ) সাতটি মাটির প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। এই সব প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থানে ৬০ হাত প্রশস্ত এক একটি পরিখা ছিল। এই গড়ের চারিদিকে ৪টি বিরাট বিরাট তোরণ এবং মাঝে মাঝে গবাক্ষও ছিল। উত্তর দিকের তোরণের পাশেই কোচদের একটি মন্দির ছিল। পরে এই মন্দিরটি নাকি একটি মসজিদে রূপান্তরিত হয়। ১৮৯৭ সনের (১৩০৪ বাঃ) ভীষণ ভূমিকম্পে এই গড় ও পরিখাগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই প্রাচীরগুলির ভগ্নাবশেষ এখনও রহিয়াছে। প্রতি বৎসর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দলিপার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই অঞ্চলের কৃষকদের ৭ দিন ব্যাপী এক মেলা বসে।

১৫৮৪ সনে সাহাবাজ খাঁ কুম্বো বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁহার অধীনে শের আলী গাজি ছিলেন সেরপুরের ভূম্যধিকারী। এই শের আলী গাজীর নাম হইতেই এই পরগণা সেরপুর নামে অভিহিত হয়। "বর্তমান

"গাজীর খামার" গাজীর ভিটা প্রভৃতি ছিল শাসনকর্তা গাজীদের আবাসভূমি। এই অঞ্চলের রাজস্ব আদায়কারী রমাবল্লভ মজুমদারের বিধবা স্ত্রীর এক আবেদনক্রমে "আরবী কেসার" বিধিমতে শের আলী গাজীর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। এবং তাহার পুত্র রামনাথ চৌধুরী এই জমিদারী লাভ করেন। ১৭৯০ সনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডব্লু উ রঙটন (Mr. W. Wrongton) প্রথমেই জমিদারগণের সহিত দশসালা বন্দোবস্ত করেন। পরে মিঃ স্টিফেন (Mr. Stephen Beyard) বায়ার্ড চৌধুরীদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। সংক্ষেপে এইভাবেই হয় সেরপুর পরগণার জমিদারীর গোড়াপত্তন।

অপর দিকে ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঈশা খাঁর জনৈক সৈনিক সোমেশ্বর সিং (পাঠক) এই পরগণার পূর্ব দিকে সোমেশ্বরীর তীরে আসে। খুব সহজেই তিনি অতিথিপরায়ণ ও বন্ধুবৎসল হাজংদের বন্ধুত্ব ও আনুগত্য লাভ করেন। এই সোমেশ্বর সিং হাজংদের বাহুবলের সাহায্যে এই অঞ্চলের দুর্দান্ত হোচং ও দুর্গা গারো সর্দারদ্বয়কে পরাজিত ও নিহত করিয়া সমস্ত গারো সম্প্রদায়কে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। কথিত আছে যে হাজংদের সাহায্যে সোমেশ্বর সিংহের সুসং লাভ করায় এবং দুর্গা গারোর স্মৃতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই এই রাজ্যের নাম রাখা হইয়াছিল সুসং দুর্গাপুর। সোমেশ্বর সিং ছিলেন সুসং জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা—তাহার বংশই এই অঞ্চলের প্রাচীনতম জমিদার বংশ বলিয়া পরিচিত।

এই আদিবাসী অঞ্চলের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে দুইজন পরাক্রান্ত কোচ সর্দারের রাজত্ব ছিল। "দিল্লীশ্বর আকবরের রাজত্বকালে ঈশা খাঁ যখন পূর্ব ময়মনসিংহ আক্রমণ করে তখনও এই অঞ্চলে দুইজন কোচ রাজা রাজত্ব করিতেন। একজনের রাজধানী ছিল মৈমনসিংহ শহরের অনতিদূরবর্তী বোকাইনগর ও আর একজনের রাজধানী ছিল কিশোরগঞ্জের অনতিদূরবর্তী জঙ্গলবাড়ী। ঈশা খাঁর অধিকারের পর হইতে এই অঞ্চলের কোচ

অধিবাসীদিগের উপর মুসলমান ধর্ম ব্যাপক বিস্তার লাভ করিতে আরম্ভ করে।"

এই ভাবে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক হইতে আক্রান্ত হইয়াও আদিবাসী সর্দারগণ কিন্তু খুব সহজে আত্মসমর্পণ করে নাই। পর পর অনেকগুলি খণ্ড সংগ্রামে হয় তাহারা মৃত্যুবরণ করিয়াছে না হয় পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। এমনকি প্রয়োজন হইলে গভীর হইতে গভীরতর অরণ্য-পর্বতেও আত্মগোপন করিয়াছে, তবুও তাহারা বশ্যতা স্বীকার করিতে চায় নাই। আদিম অধি-বাসীরা স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবে জীবনধারণ করাই শ্রেয় মনে করে। ইহা তাহাদের সহজাত গোষ্ঠীগত প্রকৃতি। এই মনোভাব নিঃসন্দেহে আদিবাসীদের স্বাধীনতাপ্রীতিরই পরিচায়ক। সভ্য মানুষের মনে স্বাধীনতার চেতনা যতটা সত্য ও গভীর আদিবাসীদের তাহা হইতে কম নয়। অবশ্য তাহাদের আঞ্চলিক দেশাত্মবোধ ও অনুভূতিও তেমনই প্রবল। তাই বহু ক্ষেত্রেই ইহাদের প্রাণ বলিদান দিয়াও আঞ্চলিক স্বাধীনতা ও নিজেদের সমাজস্বাতন্ত্র রক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে।

বাংলার লোক সাহিত্য, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, Cal. U. 1926. পুঃ বঃ গীতিকা

সংগ্রামী ঐতিহ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভ ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলা ও বিহারের দেওয়ানী লাভ করার ফলে ভারতীয় সমাজের সুপ্রাচীন কাঠামো একদম ভাঙিয়া যায়। ইংরাজ বা ইংরাজদের আশ্রিত রাজা জমিদারদের বিরুদ্ধে সেই সময় প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষভাবে সহসা কেহ বিদ্রোহ করিতে অগ্রসর হইত না। ঠিক এই সময় দেখা দেয় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। সামন্ততান্ত্রিক অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করিয়া ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের তাৎপর্য অনুধাবন ও মুল্যায়ন করিতে হইলে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

১৭৬৩ সনে সন্ন্যাসী বিদ্রোহীরা ঢাকা শহরের উপর হানা দিয়া ইংরাজ ফিরিঙ্গিদের কারখানা লুঠ করে। বিশেষ করিয়া ১৭৬৯-৭০ সনের দুর্ভিক্ষের দিনে রাজস্ব আদায়ের জুলুমের ফলে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ১৭৭৩ সনে এই অঞ্চলের কৃষকগণ সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে সেরপুর, আলাপসিং ও জাফরশাহী পরগণার জমিদারদের তথা ইংরাজদের রাজস্ব আদায়ের কাছারিগুলি উচ্ছেদ করার জন্য আক্রমণ ও লুঠতরাজ শুরু করে। এই অঞ্চলে প্রচলিত কিংবদন্তি হইতে বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে পূর্ববঙ্গে এই বিদ্রোহের সন্ন্যাসী নেতৃবৃন্দ দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল উত্তরবঙ্গ হইতে কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা মহকুমার চিলমারী—রৌমারী—মহেন্দ্রগঞ্জ পথে এবং কামারজানি-দেওয়ানগঞ্জ হইয়া গভীর অরণ্য ও বালুকাময় পথে সেরপুর ও আলাপসিং পরগণায় প্রবেশ করে। এই দলের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল গারো পাহাড়ের শাহ কামালের দরগা।

অপর দল অর্থাৎ অধিকাংশ বিদ্রোহীগণ জলপথে দক্ষিণে চলিয়া যায়। সেরপুরের উত্তরে চরণতলায় সন্ন্যাসীদের গোপন ঘাঁটি ছিল। এই অঞ্চলের বিক্ষুব্ধ কৃষকদের সঙ্গে লইয়া তাহারা দক্ষিণে জমিদারদের রাজস্ব আদায়ের কেন্দ্রগুলি আক্রমণ করিত। চরণতলায় যে অক্ষয়বটের নীচে সন্ন্যাসীরা প্রথম আস্তানা করিয়াছিল সেইখানে এখনও প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে হাজং, কোচ, হদি প্রভৃতি আদিবাসীগণ মেলায় জমায়েত হয় এবং কালীপূজায় প্রায় লক্ষ ছাগ, মহিষ, কবুতর বলি দেয়। সমবেত মেলার জনতা সন্ন্যাসীদের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করে। হাজংদের পূর্বপুরুষ বলিয়া কথিত বিদ্রোহী ভুপাল গিরিকে স্মরণ করিয়া এখনও তাহারা গৌরব বোধ করে। নালিতাবাড়ীর দুই মাইল পশ্চিমে সন্ন্যাসী ভিটা, ব্রহ্মপুত্রের বেলা-ভূমিতে সন্ন্যাসীর চর আজও সেই বিদ্রোহীদের অমর স্মৃতির স্বাক্ষর বহন করিতেছে।

১৭৮৩ সনে সন্ন্যাসীগঞ্জে (বর্তমান জামালপুর মহকুমা শহর) সেনানিবাস (Cantonment) স্থাপিত হয় এবং মিঃ লজ (Lodge) সন্ন্যাসীদের দমন করে।

১৭৯৩ সনে বাংলার ভূমিব্যবস্থা ও বাঙালী সমাজজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ইংল্যাণ্ডের সামন্তপ্রথার অনুকরণে বাংলার ভূমিব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। ইংল্যাণ্ডের ন্যায় বাংলা দেশেও সৃষ্ট হয় ইংরাজদের অনুরক্ত একদল জমিদার। এই জমিদারগণ বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে কর্তৃত্ব লাভ করিয়া সাংস্কৃতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। এই পশ্চাৎপদ অরণ্যময় ভূমি ও হাওড় অঞ্চল তাহাদের স্বার্থে ক্রমশ সুন্দর কৃষিভূমি ও বাসোপযোগী ভূমিতে পরিণত হয়। ক্রমে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, বঙ্গজ কায়স্থ ও তাহাদের অনুগামী অন্যান্য সম্প্রদায়ও আদিবাসীদের প্রতিবেশী হিসাবে বসবাস শুরু করে। ফলে এই অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রাচীন সমাজজীবনে উহার প্রতিফলন দেখা দিল;—তাহাদের সাংস্কৃতিক

জীবনও নানাভাবে প্রভাবিত করিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ শোষণ ও অত্যাচারের নীতি প্রবর্তিত হইল। জমিদারদের নিম্নস্তরে সৃষ্টি হইল তালুকদার, জোতদার, পত্তনীয়াদার, দরপত্তনীয়াদার প্রভৃতি কৃষির উপর নির্ভরশীল বিরাট একদল মধ্যস্বত্বভোগী। কোন কোন স্থলে কৃষক ও জমিদারদের মধ্যস্থলে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা ১২ হইতে ২৫ রকম পর্যন্ত পৌঁছিয়া ছিল। শেরপুর পরগণায় এই মধ্যস্বত্বভোগীদের মোট ৮৭টি এস্টেট ছিল। গবর্নমেন্টের বা জমিদারের রাজস্ব যাহাই হোক না কেন বাস্তব ক্ষেত্রে বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়া উহাই নির্মম বর্ধিত শোষণের সৃষ্টি করিল। কৃষকদের স্বাভাবিক সহজ সরল জীবন কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে লাগিল। “কোন বৎসর শস্য হোক বা না হোক তাহারা নিয়মিত রাজস্বের একটি পয়সাও পরিত্যাগ করেন না, এতদ্ভিন্ন ইজারাদার পত্তনীয়াদার ও দরপত্তনীয়াদার ইত্যাদি বহু লোক কৃষকের পরিশ্রমার্জিত বস্তুর অংশ গ্রহণ পূর্বক আপনাপন উপার্জনে তৎপর থাকাতে কৃষকের অবস্থা অতিশয় ক্লেশদায়ক হইয়াছে, কোন দয়াবান মনুষ্য যদ্যপি মফঃস্বলে কৃষকের বাটীতে প্রবেশ পূর্বক তাহার অবস্থা সন্দর্শন করেন তবে তাহার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইয়া নয়নযুগে কেবল আক্ষেপবারি নির্গত হইতে থাকে এবং তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক এমত ক্লেশসূচক অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। হা পরমেশ্বর! যাহাদিগের অধীনস্থ প্রজামণ্ডলীর ইদৃশ দুরাবস্থা তাহাদিগের সুসভ্য ও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিতে কি লজ্জাবোধ হয় না?

পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার ও ইজারাদার ও বাড়ীদারদিগের অত্যাচারেব ব্যাপার আমরা পুনঃ পুনঃ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া থাকি, ঐ সকল দৌরাত্ম্য কোন কালে নিবারণ হয় এমত বোধ করি না, দীন ও দুঃখীদিগের দুঃখ বিবরণ বর্ণন করিতে আমারদিগের কাষ্ঠের লেখনী করুণ রসে আর্দ্র হইতেছে, জমিদার, ইজারাদার, যোতদার প্রভৃতি দ্বার হইতে

মুক্ত হইলেও বাড়ীদারদের বাড়ির প্রহার হইতে রক্ষা কখনও সম্ভব না।"

ইহাই হইল সেদিনকার কৃষি বাংলার বাস্তব জীবনচিত্র। জমিদার তথা জমিদার-কর্মচারীগণ যেমন নায়েব, মহরার হইতে পেয়াদা পর্যন্ত আবওয়াব, মাথট, তহশীলদারের রাহা ও বাসা খরচ, পেযাদার রোজ প্রভৃতি হরেক রকমের উচন্তি ছলে বলে কৌশলে আদায় করিত। এমনকি দাখিলায় টাকার অঙ্ক মিথ্যা লিখিয়া নানা প্রকারে সরলচিত্ত অজ্ঞ চাষীদের প্রতারণা করিত, শোষণ করিত। তাই প্রায় সমস্ত কৃষকই ছিল ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ। অল্প সময়ের মধ্যেই বাস্তব ঘটনাবলী ও জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে প্রজারা বুঝিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তাহাদের কোন স্বার্থ রক্ষিত হয় নাই। এমনকি ভূমিতে তাহাদের পুরাতন স্বত্ব স্বামিত্ব একেবারেই বিলোপ করা হইয়াছে।

অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ত্রিশ বৎসর কৃষকগণ বিদ্রোহের পর শুধু বিদ্রোহই করিযাছে। এই সময়ে এই অঞ্চলের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ হইতেছে বাধ্যতামূলক "হাতীখেদার" বিরুদ্ধে সুসং পরগণার হাজং বিদ্রোহ। হাজংগণ এই এলাকার গভীর অরণ্যের মধ্যে সুবিধাজনক স্থানে মজবুত গজারী গাছের খুঁটি দিয়া ঘেরাও করিয়া ভিতরে হাতীর লোভনীয় খাদ্য কলাগাছ ও ধানের আবাদ করিত এবং পোষা শিক্ষিত "কুনকী" হাতীর সহায়তায় নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া কৌশলে বন্য হাতী ধরিত। সুসং এর জমিদারগণ হাজংদের নিকট হইতে এই সব হাতী লইয়া ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে বিক্রয় করিতেন।

এই হাতী বিক্রয় করিয়া তাহারা শুধু অর্থ উপার্জনই করিত না, সুনাম

সংবাদ প্রভাকর : সম্পাদকীয় ১১।৩।১২৬৮

সুযশ ও খেতাবও পাইত। তাই প্রতি বৎসর হাতীখেদা তৈরি করিয়া অধিকসংখ্যক হাতী ধরার জন্য তাহারা হাজংদের উপর চাপ দিত। পরবর্তী সময়ে হাতীখেদায় কাজ করার জন্য বাধ্যতামূলক বেগার প্রথাও চালু করিতে চেষ্টা করে। হাজংরা এই বাধ্যতামূলক বেগার প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিলে জমিদারগণ নানাভাবে অত্যাচার ও উৎপীড়ন শুরু করে। মনা সর্দারের নেতৃত্বে হাজংগণ সুসং জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহে কয়েকজন বিক্ষুব্ধ গারো সর্দারও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। ফলে সারা সুসং পরগনায় একটা বিরাট কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দেয়। জমিদারগণ হাতী ধরায় ওস্তাদ মনা সর্দারকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলিয়া হত্যা করে। ফলে সমগ্র হাজং, গারো কৃষক সম্প্রদায় সুসংএর বারোমারি ময়দানে প্রকাশ্য ভাবে জামদারদের এক বাহিনীকে আক্রমণ করে। দক্ষ ও উপযুক্ত হাতীর মাহুতরা হাতী ছাড়িয়া দিয়া বিদ্রোহে সক্রিয অংশ গ্রহণ করে। হাতী চালনায ও হাতীর বোধগম্য সব রকম বুলিতে (ভাষা) দক্ষ হাজংগণ বিভিন্ন কৌশলে জমিদারদের সমস্ত হাতীগুলিকে ক্ষিপ্ত করিয়া দিল। অপর দিকে বিদ্রোহী কৃষকগণ সুসং, দুর্গাপুর আক্রমণ করিলে জমিদার-গণ নেত্রকোণায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ফারাংপাড়া, বিজয়পুর, চেংনী, ধেনুকা, আড়াপাড়া, ভরতপুব প্রভৃতি জঙ্গলের খেদাগুলি তাহারা নষ্ট করিয়া ফেলে। চার পাঁচ বৎসর পর্যন্ত এই বিদ্রোহ ও সংঘর্ষ চলিয়াছিল। এই হাতী খেদা বিদ্রোহে বেতগড়ার রাতিং হাজং, ধেনকীর মঙ্গলা, লেঙ্গুরার বিহারী, হদিপাড়ার বাঘা, ফান্দাগ্রামের জগ, বিজয়পুরের সোয়া হাজং প্রভৃতি মারা যান। বাগপাড়ার গযা মোড়লকে জমিদারগণ ধরিয়া লইয়া যায়। সে আর গৃহে ফিরে নাই। মলা ও তংলু নিখোঁজ হয়। সুসং পবগনার এই হাতী খেদা বিদ্রোহের পর আর বাধ্যতামূলকভাবে হাতী খেদার কাজ হয় নাই। এই হাতী খেদার বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের কৃষক-বিদ্রোহের বিভিন্ন কাহিনী আজও আদিবাসীদের গ্রামে গ্রামে উপকথার মতো ছড়াইয়া আছে।

এই অঞ্চলের সুসং পরগণায় যখন বিরাট একটা কৃষক-বিদ্রোহ চলিতেছিল ঠিক সেই সমসাময়িক সময়েই ১৮২০ সালে সেরপুরের জমিদারী নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হইল। জমিদারগণ এই বাটোয়ারার যাবতীয় খরচপত্র এমন কি নূতন নূতন ডিহি কাছারি খোলার খরচ পর্যন্ত প্রজাদের ঘাড়ে চাপাইল। জমির জন্য দেয় রাজস্বের পরিমাণও কিছুটা বৃদ্ধি করিল। ইহার ফলে প্রথমে সমস্ত প্রজা বিনীতভাবে এই ধরনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আবেদন নিবেদন জানাইল কিন্তু জমিদারগণ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। বরং নূতন আবওয়ার, মাথট সহ ধার্য খাজনা আদায় করার জন্য জোর জুলুম অত্যাচার উৎপীড়ন শুরু করিল। ফলে ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই দেখা দিল আর একটি বিদ্রোহের সূচনা। বিশেষ বিশেষ মৌজায় প্রজারা একযোগে বাড়তি খাজনা দিতে অস্বীকার করিল,— জমিদার উহা আদায়ের জন্য দৈহিক নির্যাতন আরম্ভ করিল। এইভাবে দুই বৎসর চলার পর ১৮২২ সালে এই অঞ্চলের বিদ্রোহী নায়ক বকস্থ ও দীপচাঁন প্রমুখ সুসং দুর্গাপুরের পাগলপন্থী নেতা টিপু সরদারকে সেরপুর অঞ্চলে বিদ্রোহ পরিচালনা করার জন্য আহ্বান করেন। পাগলপন্থী টিপু তাহার অনুগামীদের লইয়া কৃষকদের স্বার্থে দণ্ডায়মান হন এবং সমস্ত বিক্ষুব্ধ প্রজাকে লইয়া সেরপুর জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। জমিদাররা খাজনা আদায়ের জন্য বলপ্রয়োগ কারলে কৃষকগণ সংঙ্ঘবদ্ধভাবে জমিদারদের পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজদের আক্রমণ করে। শহরের বাহিরের ডিহি কাছারিগুলি বিদ্রোহীরা দখল করিয়া আক্রমণের এক একটি ঘাটিতে পরিণত করে। এই সব ঘাটি হইতে বিদ্রোহী কৃষকগণ সেরপুর শহরের উপর মূহুর্মুহু আক্রমণ করে। বিদ্রোহী প্রজারা জমিদারদের বাড়িঘর লুণ্ঠন করে। বিদ্রোহীদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া জমিদাররা সপরিবারে দলে দলে সেরপুরের উত্তরে তদানীন্তন কালিগঞ্জের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডেম্পিয়ার সাহেবের কাছারিবাড়িতে

আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্তমান নৌহাটার পশ্চিমে মৃগী নদীর তীরে এই কালীগঞ্জ মহকুমায় একটি সেনানিবাস ছিল।

এই কৃষক বিদ্রোহে টিপুর নেতৃত্বে কৃষকগণ সেরপুরে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। বিদ্রোহীরা গরজরীপার প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে তাহাদের সরকার স্থাপন করে। বিদ্রোহীদের এই স্বাধীন রাজত্বে নায়ক বকসু ছিলেন বিচার বিভাগের দায়িত্বে, দীপচাঁন ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করিতেন আর গুমানু সরকার সমস্ত দলিল দস্তাবেজ কাগজ পত্র রক্ষা করিতেন। টিপুর নেতৃত্বে তিন বৎসরকাল কৃষকদের এই স্বাধীন রাজত্ব চলিয়াছিল।

বিদ্রোহী কৃষকদের এই স্বাধীন রাজ্য সম্পর্কে বর্ণনা করিতে যাইয়া সেরপুরের রামনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"বকসু জজিয়তি করে, দ্বীপচাঁন কালেক্টার
নথীপত্র পেশ করে গুমানু সরকার।"

এই বিদ্রোহ দমন করার জন্য কালীগঞ্জের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডেমপিয়ার (Mr. Dampier) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডানবার (Mr. Dunbar)-এর নিকট আরও অধিক পরিমাণে সৈন্যের জন্য আবেদন করেন। রংপুরের সৈন্যশিবির ও জামালপুর হইতে বিপুল পরিমাণে Light Infantry সমাবেশ করিয়া মিঃ ডেমপিয়ার ও ডানবার ক্যাপ্টেন গেরেট (Capt. Garret)-এর নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। এই বিদ্রোহে বহু কৃষক প্রাণ দেয়। ১৮২৭ সালে নায়ক টিপু বন্দী হন এবং ময়মনসিংহের দায়রা জজের বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। 'কালাপানির' জেলে টিপুর মৃত্যু হয়।

ইংরাজ সৈন্যের হস্তক্ষেপের পরেও এই কৃষক-বিদ্রোহ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আবার নূতন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩১ সালে কালীগঞ্জ হইতে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারি ও সেনানিবাস উঠিয়া যায়। কালীগঞ্জের সেনানিবাস উঠিয়া যাইবার সঙ্গেসঙ্গেই আত্মগোপনকারী

বিদ্রোহী কৃষকগণ আবার বিদ্রোহ শুরু করে। এই অঞ্চলের দুর্ধর্ষ হদি সম্প্রদায়ের দুইজন সর্দার জানকু পাথর ও দুবরাজ পাথর এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। এই দুইজনেব নেতৃত্বে কৃষকরা নলিতাবাড়ি ও বাটাজুর হইতে সেরপুর আক্রমণ করে। বিদ্রোহীরা প্রথমে থানায় আগুন লাগাইয়া দেয় এবং কিছু অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করে। পরে জমিদারদের কাছারি বাড়ি লুণ্ঠন করে। সশস্ত্র সিপাহী পুলিস বরকন্দাজদের মিলিত বাহিনী দুবরাজ ও জানকুব গেরিলা আক্রমণে বিপর্যস্ত ও বিমূঢ় হয়। তাহারা দুইজন কখনও পৃথকভাবে কখনও একযোগে পরিকল্পনা করিয়া আক্রমণ করিতেন।

এই বিদ্রোহে ভীত হইয়া ম্যাজিস্ট্রেট ডানবার কর্তৃপক্ষকে লেখেন—"Fresh disturbances of a very serious nature have occurred in Sherpur". এই চিঠিতে তিনি অবিলম্বে প্রচুর সৈন্য ও গোলাবারুদ চাহিয়া আবেদন করেন। ক্যাপটেন সীল (Capt. Seal) ও লেফটানেণ্ট ইয়ং হাজব্যাণ্ড (Lt. Young husband) প্রচুর সৈন্য সামন্ত ও গোলাবারুদ লইয়া সাময়িকভাবে সেবপুবে শিবির স্থাপন করেন এবং ধারাবাহিকভাবে বিদ্রোহীর উপর বঠিন আক্রমণ চালান।

দুবরাজ ও জানকু পাথরেব নেতৃত্বে হাজার হাজার সশস্ত্র কৃষক প্রতিরোধ করে। টোগলাপাড়া, জলাঙ্গী, নালিতবাড়ি, হালুয়াঘাট প্রভৃতি স্থানে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। দীর্ঘদিন বহু বীরত্বপূর্ণ লড়াই করিয়া বিদ্রোহী কৃষকগণ আধুনিক অস্ত্রেব বিরুদ্ধে ক্রমে হীনবল হইয়া পড়ে। কাল ভদ্র ও পণ্ডিত মণ্ডল নামে দুইজন বিদ্রোহী নায়ক বন্দী হন এবং পাঁচজন সর্দার বহু সংখ্যক বিদ্রোহী সহ আত্মসমর্পণ করেন। বাদবাকি বিদ্রোহীদের মধ্যে অনেকে কড়ইবাড়ি ও গারো পাহাড়ে পশ্চাদপসরণ করেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও বিদ্রোহের নায়ক জানকু ও দুবরাজকে ধরিতে পারা যায় নাই। এমনকি তাহাদের খোঁজ খবর পর্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারে নাই। ১৮২১ হইতে ১৮৩১ পর্যন্ত এই কৃষক-বিদ্রোহ প্রায় বিরামহীন ভাবেই চলিয়াছিল।



একটি বিপ্লবী সমাবেশ (১৯৪৬)



"রাসমণি বাহিনী"র অভিযান

ভূমিব্যবস্থা

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ঐতিহাসিক সিপাহী-বিদ্রোহ হয়। তারপর বিভিন্ন সময়ে প্রজাদের স্বার্থরক্ষার নামে প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তিত হয়। ১৮৫৯ সালে প্রজাস্বত্ব আইনকে তো কৃষকদের "সনন্দ পত্র" নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এই সনন্দ পত্রও কৃষকদিগকে জুলুমের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। এই সব আইনের মাধ্যমে জমিদারগণ বরং নিজ নিজ জমিদারীতে সুবিধা মতো কিছু কিছু মধ্যযুগীয় ভূমিব্যবস্থা কায়েম করার ব্যবস্থা করে। তাহার কদর্য রূপ দেখা যাইবে প্রকৃতির বন্য লীলাভূমি এই উত্তর ময়মনসিংহের শান্ত স্নিগ্ধ আদিবাসীদের গ্রামগুলিতে। টঙ্ক, নানকার, ভাওয়ালী, খামার প্রভৃতি মধ্যযুগীয় দুষ্ট প্রথা দূষিত ক্ষতের মতো দীর্ঘদিন এই এলাকার ভূমি-ব্যবস্থায় টিঁকিয়া থাকে। পরবর্তীকালে ইহার বিরুদ্ধেই হয় বীর আদিবাসী-দের মরণবিজয়ী অভিযান।

টঙ্ক প্রথায় প্রজা বা রায়তকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির বাবদ জমিদারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য দিতে হয়। অর্থাৎ জমির খাজনা টাকায় পরিশোধ না করিয়া উৎপন্ন শস্যে করিতে হয়। হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, ইহাতে দোষনীয় বা আপত্তিজনক কি আছে? প্রথমত আপত্তি এই যে, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা কীট পতঙ্গ (পঙ্গপাল, লোহাজুড়ি) বন্য জন্তুর আক্রমণে উক্ত জমিতে শস্য উৎপাদন না হইলেও টঙ্কচাষী তাহার উপর ধার্য খাজনা বাবদ শস্য দিতে বাধ্য। এই টঙ্ক জমিতে চাষ আবাদ করার জন্য জমিদার হাল, বীজ, সার, জল সেচ, আল বাঁধা প্রভৃতি কোন

টঙ্ক

রকম দায়িত্বই গ্রহণ করে না; ব্যয়ভারও বহন করে না। অথচ প্রজা বা রায়তের নিকট হইতে ধার্য ফসল গ্রহণ করার সে সম্পূর্ণ অধিকারী। টঙ্ক জমি প্রথম অবস্থায় সন পাট্টা অর্থাৎ ১ সনের মেয়াদে বিলি ব্যবস্থা বা পত্তন করা হইত, পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে পত্তন করা হইত। জমিদার প্রতি বৎসর ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাপ্য টঙ্ক ধান বুঝিয়া পাইয়া পরবর্তী বৎসরের জন্য আরো উচ্চ হারে খাজনার দাবি স্থির করিয়া পুরাতন চাষী অথবা অন্য কোন নূতন চাষীর নিকট জমি পত্তন করিত। এক কথায় টঙ্ক জমিতে প্রজা বা রায়তের কোনরকম স্ব-স্বামিত্বত্ব জন্মিত না। জমিদার ইচ্ছা মতো টঙ্ক জমি হাত বদল করিয়া প্রজাপত্তন করিতে বা খাস পাতত রাখিতে পারিতেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কোন সুবৎসরেও টঙ্ক চাষীকে উৎপাদিত শস্যের অর্ধেকই জমিদারকে খাজনা বাবদ দিতে হইত। বাকি অর্ধেক চাষী নিজের সমগ্র পরিবারের ভরণ-পোষণ, শ্রম, হাল, বলদ, কৃষিযন্ত্র, বীজের মূল্য প্রভৃতি বাবদ রাখিতে পারিত। টঙ্ক জমিতে শস্য কম বেশী যাহাই হউক না কেন, অনিবার্য কারণে যদি শস্যহানি হয় অথবা দুর্ঘটনাবশতঃ চাষী যদি কখনও জমি চাষ করিতে না পারিয়া থাকে তবুও চাষীকে কবলা বর্ণিত ধার্য ধান ক্রয় বা ঋণ করিয়া হইলেও জমিদারকে দিতে হইত। অবস্থা বিশেষে বাকি বকেয়া টঙ্ক ধান পরবর্তী বৎসরে সুদ সহ আদায় করিবারও ব্যবস্থা ছিল। এমন ঘটনাও দেখা গিয়াছে যে, বাকি টঙ্ক ধান পরিশোধ করার ফলে চাষীকে সমস্ত উৎপন্ন শস্যই জমিদারকে দিতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, জমিদারগণ মহাজনী কায়দায় বাকি টঙ্ক ধানের সর্বোচ্চ মূল্য ধরিয়া তাহার উপর সুদ কষিয়া পরবর্তী মরসুমে উক্ত টাকার বিনিময়ে ফসল আদায় করিত। অসমর্থ চাষীদের হালের বলদ, গরু-বাছুর, ঘরের টিন বা থালা ঘটি পর্যন্ত ক্রোক করা হইত। টঙ্ক প্রথায় আবাদী জমির সংলগ্ন অনাবাদী ছোট টিলা, ডাঙা, খানা-ডোবা পর্যন্ত জমির সহিত যোগ করিয়া চাষীর নামে পত্তন দেখাইয়া উক্ত অনাবাদী জমির দরুনও কৌশলে

টঙ্ক ধান আদায় করা হইত। টঙ্ক চাষীর অবর্তমানে তাহার বংশধরদের উপর বাকি বকেয়া ঋণ বর্তাইত। কিন্তু টঙ্ক জমির উপর উত্তরাধিকারীদের কোন স্বত্ব-স্বামিত্ব বা অধিকার স্বীকৃত হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে চাষীকে টঙ্ক ধান স্বয়ং বহন করিয়া জমিদারদের গোলায় পৌঁছাইয়া দিতে বাধ্য করা হইত। অথবা চাষীর নিকট হইতে পৌঁছানোর খরচ আদায় করা হইত। এই অঞ্চলে বিশেষ করিয়া সুসং পরগনায় এই টঙ্ক প্রথা ছিল ব্যাপক; আর ইহার প্রধান বলি ছিল হাজং কৃষকরা। এই টঙ্ক প্রথার শোষণের তীব্রতা কত গভীর ছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মেলে লেঙ্গুরা মৌজায়। শুরুতে এই মৌজার স্থিত ছিল মাত্র ৬৩ টাকা, আর তাহাই ১৯৪০ সালে দাঁড়ায় ৫ হাজার টাকায়। ইহা এক নির্মম সামন্ততান্ত্রিক শোষণ প্রথা। তাই ইহার ফলে প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হইয়াছিল ভীষণতম। ১৯৪৭ সালের পরেও অনেকদিন পর্যন্ত এই জঘন্য প্রথা ইহার দুষিত ও কদর্য চেহারা লইয়া বর্তমান ছিল। তাই টঙ্ক প্রথা উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত বার বার ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে।

নানকার

নানকার প্রথাকে বেগার বা চাকরান প্রথাও বলা হয়। স্থানীয় ভাবে এই নানকারী প্রজা বা রায়তদের "বেগারী" বলিয়া সম্বোধন করা হইত। এই প্রথায় নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ভোগ-দখলের বিনিময়ে প্রজা বা রায়ত প্রতিমাসে বা বৎসরে নির্দিষ্ট কিছুদিন জমিদার বাড়িতে দৈহিক শ্রম দিতে বাধ্য থাকিত। অর্থাৎ নানকার প্রজা বা রায়তকে ভূস্বামীর বাড়িতে বিনা পারিশ্রমিকে যাবতীয় হীন ও কষ্টসাধ্য কাজকর্ম করিতে বাধ্য করা হইত। ইহাদিগকে গৃহদাস বলা চলে। এই প্রথায় প্রতি একর জমির প্রজা জমিদারকে প্রতি মাসে ৫ হইতে ৭ দিন পর্যন্ত দৈহিক শ্রম দিত, তাহা ছাড়া বিশেষ কোন কাজ উপলক্ষে বা জরুরী প্রয়োজনে তলব করিলেও নানকারী প্রজাকে জমিদারের হুকুম তামিল করিতে হইত। নানকারী জমিতে প্রজার কোন স্বত্ব ছিল না। অর্থাৎ এই জমি ক্রয় বিক্রয় বা কোন রকমে হস্তান্তর করা চলিত

না। কবলা বর্ণিত নির্দেশ মতো নানকারী প্রজা নিজে অথবা অন্য কোন প্রতিনিধি পাঠাইয়া মালিক সরকারে নিয়মিত দৈহিক শ্রম দিয়া গেলে পুরুষানুক্রমে এই জমি ভোগ দখল করা যাইত। নানকারী প্রজার অবর্তমানে তাহার বিধবা স্ত্রী বা নাবালক পুত্র কোন লোক নিযুক্ত করিয়া জমিদারকে শ্রম দিবার ব্যবস্থা করিলে উক্ত জমি ভোগ দখল করিতে পারিত। এই বর্বর প্রথা আমাদিগকে মধ্যযুগের দাস প্রথা, ছোটনাগপুরের "কামিউতি", উড়িষ্যার "গোষ্ঠীপ্রথা", উত্তর পূর্ব সীমান্তের "ডুডাং" প্রথার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

শেরপুর পরগনার হাঁদি ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই এই প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। নানকারী প্রজাগণ প্রতি ৭ দিন, ১০ দিন বা ১৫ দিন অন্তর অন্তর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া জমিদারদের সদর কাছারিতে আসিত এবং নিজেদের উপস্থিতি লিখাইয়া ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নির্দেশ মতো নিজেদের মধ্যে যাবতীয় কাজ ভাগ করিয়া লইত। জমিদার-বাড়ির সমস্ত রকম গৃহস্থালীর কাজ, যেমন, থালা-বাসন মাজা, কাপড় কাঁচা, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা, পাখা টানা, বাগানবাড়ি, ফলের বাগান, খেলার মাঠ, রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার এবং পালা করিয়া সমস্ত রাত্রি জমিদার বাড়ি চৌকি দেওয়া প্রভৃতি ছিল তাহাদের প্রধান কাজ। বিশেষ করিয়া কোন দাঙ্গা হাঙ্গামায় জমি দখল ও চর দখলের কাজে বা কোন বিদ্রোহী প্রজার জমি দখল, বাড়ি উচ্ছেদের নিষ্ঠুর কাজে এই নানকারী প্রজাদের নিয়োগ করা হইত। নানকারী প্রজাদের শৌযবীর্য শক্তি-সামর্থ্য এমনকি অমূল্য জীবনের মূল্যে জমিদারগণ তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করিত। এক একটি ক্ষত্রিয় পরিবার নানকার জমির পরিবর্তে পুরুষানুক্রমে আত্মবিক্রয় করিয়া জমিদার বংশের সেবা করিয়া যাইত। অথচ নিয়তির এমনই পরিহাস যে, এই নানকার প্রজাদের উপর আর্থিক ও সামাজিক নির্যাতন ছিল সীমাহীন ও বর্ণনাতীত। মানবতার সামান্যতম অধিকারটুকু পর্যন্ত ইহাদের দেওয়া হয় নাই।

ভাওয়ালী প্রথা এই অঞ্চলে সর্বত্র দেখা যায় না এবং ইহা খুব পুরাতনপ্রথাও

নয়। সেরপুর পরগনার তালুকদারগণ খানশা[illegible], ভটপুর, কান্দুলী, ঝিনাইগাতী প্রভৃতি ইউনিয়নের রাজবংশী ও হাজং প্রজাদের উপর এই প্রথা চালু করে। এই ভাওয়ালী প্রথায় প্রজা বা রায়তকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির জন্য কিছুটা অর্থে ও কিছুটা দ্রব্যে খাজনা দিতে বাধ্য করা হইত। অর্থাৎ একই জমির জন্য অর্থ ও দ্রব্য এক সাথে দুই রকমের খাজনা চলিত; যেমন এক একর জমির জন্য বাৎসরিক খাজনা নগদ চার টাকা এবং এক জোড়া পাঁঠা অথবা উক্ত পরিমাণ জমির জন্য নগদ চার টাকা এবং দুই ছড়ি ম[illegible] ভাগ কলা বা ২৫টি ফুটি। টাকার খাজনা বছরে দুই কিস্তিতে দেওয়া চলিত কিন্তু দ্রব্যে খাজনা অর্থাৎ পাঁঠা, কলা, ফুটি ইত্যাদি কবলায় বর্ণিত নির্দিষ্ট দিনে অবশ্যই দিতে হইত। যথা দুর্গাপূজা, কালীপূজা, মনসাপূজা প্রভৃতি পূজা-পার্বণ উপলক্ষে উহা অবশ্যই দিতে হইত। এই সব দ্রব্য প্রজার নিজের থাকুক বা না থাকুক তাহাকে যে কোন মূল্যে খরিদ করিয়া হইলেও দিতে বাধ্য করা হইত। অন্যথায় এই দ্রব্যে খাজনার জন্য অসম্ভব রকমের মূল্য ধরিয়া সেই টাকা প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হইত। এই ভাওয়ালী প্রথায় প্রজা বা রায়ত জমিতে স্বত্ববান হইলেও কোন জরুরী প্রয়োজনে এই জমি বিক্রয় বা অন্য কোন ভাবে হস্তান্তরিত করিতে হইলে জমির মালিকের অনুমতি প্রয়োজন হইত, ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই মালিককে একটা নজর সেলামী না দিয়া উপায় ছিল না। এই ধরনের অলিখিত বে-আইনী আবোয়াব ছিল হরেক রকমের।

ভাওয়ালা

জমিদারগণ পুণ্যাহে, বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, পূজা-পার্বণে এমন কি শ্রাদ্ধে পর্যন্ত প্রজা বা রায়তের নিকট হইতে অর্থ, দ্রব্য ও শ্রম আদায় করিত। এই অঞ্চলের প্রজারা ছিল জমিদার ও তালুকদারের কামধেনু।

জমিদারী প্রথার শুরু হইতেই জমিদারগণ “খাস খামার” হিসাবে বহু উৎকৃষ্ট শ্রেণীর জমি নিজেদের দখলে রাখিত। এই খাস খামার জমিতে

প্রজা পত্তন না করিয়া শস্যের চুক্তিতে জমি বিলি করা হইত। এই খাস্ খামার হইতে জমিদারের আয় হইত প্রচুর।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে শিল্পে ও কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগের একটা প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই সময় কিছু কিছু সুচতুর ভূস্বামীও কৃষিতে কলের লাঙল ও যন্ত্রের আমদানী করে এবং ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপাদনে সচেষ্ট হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই ধরনের জমিদারদের সংখ্যা কম হইলেও সুদখোর মহাজনেরা কিন্তু ব্যাপকভাবে পাহাড় অঞ্চলে কৃষি-জমিতে পুঁজি বিনিয়োগ করিয়া বহু খামার স্থাপন করিল। কল-কব্জা, ট্রাকটার ইত্যাদি আমদানী না করিলেও সস্তায় কৃষিমজুর খাটাইয়া অনেক বেশী মুনাফা অর্জনের ফন্দি করিল। প্রচুর পরিমাণে ধানের আবাদ ও ফলন হয় এমন সব অঞ্চলে ২।৩ বর্গমাইল জুড়িয়া এক একটি খামাব গঠন করিয়া হাল, বলদ ও কৃষিমজুর নিয়োগ করিল এবং নিজেদের ব্যবস্থাপনায় প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন শুরু করিল। এই সব খামারের মালিকদের আর একটি কৌশল ছিল বাড়তি পুঁজি দুঃস্থ চাষীদের মধ্যে অধিক সুদে দাদন করিয়া ঠিক মরসুমের সময় খাতকদের নিকট হইতে জমিতে উৎপন্ন ধান আদায় করা। এই উদ্দেশ্যে খাতকদের নিজেদের জমির ধান কাটিয়া এই সব খামারে তুলিয়া ঝাড়াই-মাড়াই করিতে বাধ্য করা হইত এবং মহাজনরা তখন তাহাদের পাওনা সুদে আসলে আদায় করিয়া রাখিত।

খামার প্রথা

এই খামার প্রথায় খাতক ও বর্গাদার চাষীরা তাহাদের জমির যাবতীয় ফসল মহাজনদের খামারে তুলিতে বাধ্য হইত। মালিকের হিসাব মতো সব পাওনা বুঝাইয়া দেওয়ার পরে যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত তবেই চাষী তাহা নিজের ঘরে লইয়া যাইতে পারিত। দেখা গিয়াছে যে এই খামার প্রথার ফলে মহাজনদের হিসাবের জালে দুঃস্থ চাষীগণ ক্রমেই যেন অক্টোপাশের বন্ধনে জড়াইয়া পড়িয়াছে এবং শেষ পর্যন্ত কৃষক খাতক তাহার স্ত্রী-পুত্র-

পরিবার সহ রিক্ত হস্তে শুধু কুলা ডালা লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের কুঁড়ে ঘরে ফিরিয়াছে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে এই খামার প্রথা হাজং, ডালু, বানাই, কোচ, গারো এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত মুসলমান কৃষকদের জীবনে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। "ঋণ সালিশী বোর্ড" গঠনের ফলে মহাজনদের যে ক্ষতি হয়, খামার প্রথা চালু করিয়া তাহারা তাহার চতুর্গুণ সুবিধা আদায় করিয়া লয়। এই প্রথা অসংখ্য চাষীকে নিজের জমি বাড়ি হইতে উচ্ছেদ করিয়াছে এবং ঋণের দায়ে তাহার জমি মহাজনের খামারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আর কৃষকগণ সপরিবারে পরিণত হইয়াছে খামারের সস্তা ক্ষেতমজুরে। এ এক নির্মম করুণ কাহিনী।

এই ধরনের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রহিয়াছে নির্মম শোষণমূলক এক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি। এই অর্থনীতির উপর সম্পূর্ণ কব্জা করিয়া রহিয়াছে টাকা লগ্নিকারী, ধারে ব্যবসায়ী, দাদনদার একাধারে ক্রয়-বিক্রয়কারী একদল মহাজন। এই অঞ্চলের মহাজনদের অকথ্য শোষণের ইতিহাস বাস্তবিকই চমকপ্রদ, রোমাঞ্চকর ও লোমহর্ষক রূপকথার মতো। এখানকার চাষী ও মহাজনদের বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়াই লেখা হইয়াছিল "ছাতী না হাতী" *।

এই প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার একটি উদ্ধৃত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ :—"মহাজন সকল অসময়ে কৃষককে শস্যাদি কর্জ্জ দেয় এবং বীজ বপন সময়ে বীজ ধানও প্রদান করিয়া থাকে একথা অতি যথার্থ বটে কিন্তু যে পরিমাণে তাহারা গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা প্রায় অর্দ্ধাংশ বলিলেই হয় কারণ তাহারা কৃষককে ধান্য ও নগদ টাকা দিয়া থাকে, যদ্যপি দশ টাকা নগদ প্রদান করে তবে কোন সময় ১২॥ টাকা, কোন সময় ১৫ টাকা খত লেখাইয়া লয় এবং সেই খতের উপর ১২% পার্সেন্টের হিসাবে সুদ চলিয়া থাকে, আর মহাজনগণ

---

* আমার বাংলা—সুভাষ মুখার্জী।

যত্তপি ধান্য কর্জ্জ দেয় তবে আড়ি হিসাবে তাহার বৃদ্ধি ধরিয়া থাকে কিন্তু আড় প্রভৃতি পরিমাণ যদিও এ দেশে চলিত আছে কিন্তু সর্বত্র একরূপ নহে। অতএব আমরা দৃষ্টা প্রয়োগ স্থ: মোণের হিসাব লিখিতেছি, মহাজনরা যত্তপি কোন কৃষ... এক মোণ ধান্য কর্জ্জ দেয় তবে কেহ সোয়া মোণ কেহ বা দেড় মোণ আপনার খাতায় লেখাইয়া লয় এবং প্রতি মোণে সেরের হিসাবে তাহার সুদ অর্থাৎ বৃদ্ধি ধরিয়া থাকে, বীজ বপন সময়ে বীজ ধান কর্জ্জ দিলে তাহার নিয়ম আবার স্বতন্ত্র প্রকার, এক গুণ দিলে চতুর্গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই নিয়মক্রমে কৃষকোপার্জিত শস্যের দ্বারা গ্রাম্য মহাজনদিগের বিলক্ষণ পুষ্টি বর্দ্ধন হইয়া আসিতেছে, তাহাদিগের কোন বিষয়ের অভাব নাই, কেবল কৃষকদিগের পর্ণকুটীর এবং ছিন্ন বসন সার হইয়াছে, তাহারা দিবাযামিনী অবিশ্রান্ত রূপে পরিশ্রম করিয়াও স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক উদরান্ন নির্ব্বাহ করিতে পারে না। তাহারদিগের উপার্জ্জনের প্রায় সমুদায়াংশই অপরের উদরসাৎ হইয়া থাকে।" * দীর্ঘ এক শতাব্দী উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও হুবহু এই চিত্রই এখনও এই অঞ্চলে দেখা যাইবে।

টঙ্ক, নানকর, ভাওয়ালী, খামার প্রথা ছাড়াও এই অঞ্চলের অনগ্রসর চাষীদের শোষণের আরও নানা ধরনের প্রথা বা ব্যবস্থা কালক্রমে চালু করা হইয়াছিল। এই রকম একটি ব্যবস্থা হইল বন-জঙ্গলকে জমিদারের রিজার্ভ বলিয়া ঘোষণা করা। সুদূর অতীত হইতেই আদিবাসীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় জ্বালানি কাঠ প্রকৃতির অপর্যাপ্ত দান হিসাবে এই অঞ্চলের স্বাভাবিক বন জঙ্গল হইতে অবাধে সংগ্রহ করিত; কিন্তু জমিদারগণ হঠাৎ উহা তাহাদের রিজার্ভ বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাহার উপর জমা আদায় শুরু করিল, এমন কি তথাকথিত হঠাৎ হওয়া "রিজার্ভ" জঙ্গলে গরু, মহিষ চরাইতে হইলেও মাশুল আদায় আরম্ভ করিল। ফলে স্বভাবতই কৃষকদের দৈনন্দিন জীবন ক্রমশঃ

---

* সংবাদ প্রভাকর—সম্পাদকীয়। ৮।৮।১২৭০

কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইল। ইহা তাহাদের মানসিক ক্ষেত্রেও একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল।

শোষণের দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি এইরূপ: -এই অঞ্চলের কৃষকরা আবহমানকাল ধরিয়া তাহাদের গ্রামের নিকটস্থ জলায় (খাল-বিলে) অবাধে নিজেদের প্রয়োজনীয় মাছ ধরিতে পারিত। কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। কিন্তু জমিদার হঠাৎ জেলেদের নিকট অর্থের বিনিময়ে জলা পত্তন করিল, পরে চাষীদের উপরও বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া জলায় মাছ ধরা বন্ধ করিয়া দিল।

হাট বাজারের মারফৎ নানা ধরনের পীড়নমূলক শোষণ ব্যবস্থাও জমিদারগণ চালু করে। জমিদারেরা প্রত্যক্ষভাবে অথবা ইজারাদার নিযুক্ত করিয়া হাটে কৃষকদের উপর শোষণের মাত্রা বাড়াইয়া তোলে। কোন কোন হাটের বাৎসরিক আয় ১১।২০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে। এই সব হাটে-বাজারে জমিদারদের জমা আদায়ের ব্যবস্থা ছিল হিস্যা হিসাবে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লওয়া। যেমন সেরপুরের হাটগুলি :—

সোম-শুক্র—রঘুনাথ (আড়াই আনী বড় তরফ)
শনি-মঙ্গল—তেরা (আড়াই আনী ছোট তরফ)
রবি—গুরু নয় আনী (নয় আনী জমিদার)
খালি বুধে—তিন আনী (তিন আনী তরফ)

আবার, ঝিনাইগাতীতে নয় আনী জমিদার হাট বসাইল তো নন্নীতে আড়াই আনী বসাইল ; নালিতাবাড়ীতে নদীর এক পাড়ে নয় আনী অপর পাড়ে আড়াই আনী, হালুয়াঘাটে এক হাটেই পর পর ৪ জন জমিদার হাট অধিকার করিল। ঘোষগাঁওর হাট মহারাজার, ঠিক তেমনই সুসং দুর্গাপুরে কমলাকান্দা, নাজিরপুর তাহেরপুরের স্টেটের মালিকানা জমিদারদের মধ্যে ভাগাভাগি।

জমিদারদের এই সব প্রথা ও ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য এই অঞ্চলের প্রধান

প্রধান হাট ও বন্দরে তাহাদের ডিহি কাছারি এবং মহাজনদের তেজারতি গদি বা মোকাম থাকিত। টঙ্ক ধান, দাদনী টাকার ধান ও নানা ভাবে সংগৃহীত শস্য মজুত রাখার জন্য হাজার হাজার মণের এক একটি গোলাও ছিল। শুধু তাহাই নয়, এই সব ডিহি কাছারি ও গদির সংলগ্ন একটি করিয়া মালখানা বা কয়েদঘরও থাকিত। জমিদারের খাজনা ও মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইলে চাষীদের এই সব মালখানায় আবদ্ধ করিয়া দৈহিক নির্যাতন করা হইত ;—জুলাপেটা, বাঁশডলা, বেতমারা হইতে শুরু করিয়া সব রকম দৈহিক অত্যাচারই করা হইত। মৃত পিতা বা স্বামীর ঋণের দায়ে নাবালক বা বিধবা স্ত্রীকে পর্যন্ত এই সব মালখানায় আটক করিয়া টাকা আদায়ের রেওয়াজ ছিল। এই ধরনের নির্মম শোষণ পীড়ন ও অত্যাচার ছিল এই অঞ্চলের দৈনন্দিন করুণ ইতিহাস। তাই পরবর্তীকালে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত ব্যথা, বেদনা ও বিক্ষোভ ভীষণ বিদ্রোহ রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

নব জাগরণ

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে গান্ধীজি তাঁহার কর্মপদ্ধতি দ্বারা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন, এবং জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা রূপে গণ্য হন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জনসাধারণের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেন। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যেও তিনি "গান্ধীরাজা" বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। খুব স্পষ্ট না বুঝিলেও "গান্ধীরাজা" স্বরাজ চান, বিলাতি কাপড়, ছাতা ইত্যাদি তিনি কিনিতে নিষেধ করিয়াছেন এইটুকু তাহারা জানিত। সেরপুর, সুসং, নালিতাবাড়ী, হালুয়াঘাট প্রভৃতি হাট-বাজারে অসহযোগ আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকদের বক্তৃতা শুনিয়া কেহ কেহ অনুপ্রাণিত হইয়াছে:—"স্বরাজ চাই" "স্বেচ্ছাসেবক" প্রভৃতি মার্কাওয়ালা গান্ধীটুপি মাথায় পরিয়া গ্রামে গ্রামে বেড়াইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে এই অঞ্চলের আদিবাসীরা গান করিয়া প্রচার করিত :—

"গান্ধীরাজা আইল দেশে
লড়াই করে সিয়ার দাশে *
পরিও না রেশমী চুড়ি
আর নম্বরি শাড়ি
হারেরে রে হারে রে রে।"

স্কুলের ছাত্র মহেশ, নবীন, বেণীকান্ত, মণিকান্ত, গজেন্দ্র, ললিত ও নয়ান প্রভৃতি হাজং ছেলেরা ইংরেজি পড়া "বয়কট" করিল। ললিত ও নয়ান গান্ধী টুপি মাথায় পরিয়া একদম "গান্ধী রাজার" লোক বলিয়া পরিচয় লাভ করিল। এই অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলার বিপ্লবী দলের কোন

---

* C. R. Das.

কোন কর্মীও আদিবাসীদের গ্রামে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া গিয়াছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা বর্জন আন্দোলনও আদিবাসীদের মনে এক নবজাগরণ আনয়ন করে। তাঁহার বাণী "যতদিন হিন্দু ধর্মের অস্পৃশ্যতার গ্লানি দূর না হইবে ততদিন স্বরাজ পাওয়া অসম্ভব" অসহযোগ আন্দোলনের কর্মীদের মনে নূতন কর্মপ্রেরণা ও পথনির্দেশ দিল। সুসং, পূর্বধলা, চন্দ্রকোনা, নথলা ও সেরপুর থানার কর্মীরা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য সমাজসংস্কারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। হাজং, ডালু, হদি সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন বেশ ব্যাপকতা লাভ করিল। প্রথমত জল-চল ও নাপিত-ধোপ ব্যবহারের দাবিতে গ্রামে গ্রামে সভা বৈঠক ও কমিটি গঠনের কাজ চলিল, পরে নির্দিষ্ট দিনে জেলা শহরের দুর্গাবাড়ি প্রাঙ্গণে সকলে দলে দলে সমবেত হইয়া জল-চল হওয়া ও নাপিত-ধোপা ব্যবহারের দাবি ঘোষণা করিলেন। এই সমাবেশে উদার ও প্রগতিশীল ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া তাহাদের হাতের জল গ্রহণ করিলেন। সমবেত জনসাধারণ ইহাতে উৎসাহিত হইয়া গ্রামে ফিরিলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে ইহা জনসভায় আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গ্রহণেই পর্যবসিত হইল, বাস্তব জীবনে অবস্থা যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল।

১৯২৫-২৭ সালে সেরপুর পরগনার হদিগণ হিন্দুশাস্ত্র হইতে তথ্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া নিজেদিগকে হৈহয় ক্ষত্রিয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং দলবদ্ধ ভাবে উপবীত ধারণ করিলেন। হদি ক্ষত্রিয়দের এই উপবীত গ্রহণ প্রায় ৫০টি গ্রামের হদিদের মধ্যে বিপুল আলোড়ন উৎসাহের সৃষ্টি করিল। এই সময় সেরপুর টাউনের প্রগতিশীল যুবকবৃন্দ ও কতিপয় ব্যক্তি "সার্বজনীন" জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন করিয়া এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম বারোয়ারি পূজার প্রচলন করিলেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এইভাবে অনেকখানি আগাইয়া গেল।

ইহার পর ১৯২৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসু ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে জামালপুরে যে রাজনৈতিক সম্মেলন হইল তাহাতে পাঁচ শত হদি ক্ষত্রিয় শোভাযাত্রা করিয়া যোগদান করেন। এই সময় চন্দ্রকোনা, নথলা

নালিতাবাড়ি ও সেরপুর থানার ক্ষত্রিয়দের গ্রামে খাদি প্রতিষ্ঠানের শাখা ও স্কুল স্থাপিত হয়।

বিশ্ব বাণিজ্য সংকট-জনিত আর্থিক মন্দার ঢেউ এবং সময় এই অঞ্চলের হাট বাজারগুলিকে ভীষণভাবে আঘাত করে। কৃষিপণ্যের দাম একেবারে পাড়িয়া যায় শিল্পজাত পণ্য অগ্নিমূল্য হইয়া উঠে। ৬।৫ মণ ধান বিক্রয় করিয়াও চাষীরা এক খানা আট হাত কাপড় বা একখানা কোদাল ক্রয় করিতে পারে না। কৃষকদের আর্থিক সহনশীলতা সীমা ছাড়াইয়া যায়। এক শনিবারে বাগা তলা হাটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনতার বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়ে, হাটের শিল্পজাত দ্রব্যের দোকানগুলি লুণ্ঠিত হয়। হালুয়াঘাট কাছারীর সুপারিনটেণ্ডেন্ট তাহার পাঁচ জন পেয়াদা, বরকন্দাজ লইয়া ক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করিবার জন্য বন্দুক বার ভয় দেখাইলেন, দুই জন চাষীকে বন্দী করিয়া কাছারীতে আটক করিলেন। ইহার ফলে বিক্ষুব্ধ জনতা আরো উত্তেজিত হইয়া কাছারী বাড়ি আক্রমণ করিল, সুপারিনটেণ্ডেন্ট ও তাহার পেয়াদা, বরকন্দাজদের ভীষণ ভাবে প্রহার করিয়া মৃত বলিয়া ফেলিয়া দল আর বন্দী চাষী দুই জনকে মুক্ত করিয়া লইয়া গেল। এই ঘটনার পরে প্রতি হাটে হাটে সশস্ত্র সিপাহিদের টহলের ব্যবস্থা হইল।

১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি। সারা ভারতে এই দিন স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। সংগ্রামের শপথ গৃহীত হয়। এই স্বাধীনতা দিবস পালন ও শপথ গ্রহণ সারা ভারতবর্ষে সংগ্রামের আগুন জ্বালাইয়া দিল, দীর্ঘকালের জন্য এক বিরাট জনসংগ্রামের ঝড় উঠিল। নালিতাবাড়ি, হালুয়াঘাট, দুর্গাপুরে ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা উড়িল, অগণিত জনসভায় স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করা হইল। ময়মনসিংহ জেলায় সর্বপ্রথম সেরপুর হইতে যে ১৭ জন আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করিলেন তাহাদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন ইহহয় ক্ষত্রিয়। ইহার পর চন্দ্রকোনার সুধেন্দু দামের নেতৃত্বে নালিতাবাড়ি হইতে আইন অমান্য করিয়া জেলে যান। হাজং কৃষকগণও এই আন্দোলনে যোগ দেন।

হরিণকুরার বনবীর, গোবিন্দপুরের স্থরেন্দ্র, ভরতপুরের রজনী, কালিকাপুরের স্থরেন ও বসন্ত এই আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করেন। ময়মনসিংহের কুখ্যাত জিলা ম্যাজিস্ট্রেট গ্রাহাম সাহেব লেঙ্গুরার কংগ্রেস ভবনটিকে আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেয়। এই সময়ে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি বিপ্লবী অভ্যুত্থান-গুলির কথাও আদিবাসীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল।

তারপর ১৯৩৫ সালে "ভারত শাসন আইন" বিধিবদ্ধ হইলে ১৯৩৭ সনের নির্বাচনে জয়লাভ কবিয়া মৌঃ এ, কে, ফজলুল হক বাংলা দেশে মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিলেন। এই সময় স্থসং দুর্গাপুরের রাজবন্দী মণি সিং স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন। তিনি পুলিসের চোখে ধুলা দিয়া গোপনে দশাল গ্রামের মুসলমান চাষী ও লেঙ্গুরা, ভরতপুর, জিগাতলা প্রভৃতি গ্রামের হাজং চাষীদের মধ্যে কৃষক সংগঠন গড়িয়া তোলেন ও তাহাদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা জাগ্রত করার প্রাথমিক ভিত্তি রচনা করেন। এই অপরাধে ও অন্তরীণাদেশ অমান্যের অভিযোগে তাঁহাকে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। এই সময় স্থসং-এর ৩৫ মাইল পশ্চিমে নলিতাবাড়ি থানায় অন্তরীণ ছিলেন রাজবন্দী কৃষ্ণ দাশগুপ্ত ও স্থরেন দাশ। তাঁহারা ও বন্দবের শচী রায় (শহীদ) প্রমুখ ৫।৭ জন যুবককে কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করেন। ইতিমধ্যে গণ-আন্দোলনের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক কর্মী বিভিন্ন কারাগার অন্তরীণাবাস হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এই অঞ্চলে ফিরিয়া আসিলেন। ফলে স্থসং ও সেরপুর পরগনার এই আদিবাসী অঞ্চলে টংক, নানকার ও ভাওয়ালী প্রথার বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হইল, নির্বাচিত হক মন্ত্রিমণ্ডলীর নিকট দাবি-দাওয়া সহ ডেপুটেশন পাঠান হইল। জনাব হকসাহেব দমনমূলক আইন প্রত্যাহার, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধন ও ঋণভার লাঘবের প্রতিশ্রুতি দিলেন। উত্তর ময়মনসিংহের আদিবাসী অধ্যুষিত এই পাঁচটি থানা এলাকা নূতন করিয়া জরিপ করিয়া টঙ্ক জমির খাজনার নিরিখও স্বত্ব বিবেচনা করার ঘোষণাও তিনি করিলেন।

নানকার আন্দোলন

সেরপুর পরগনার নানকার প্রজাদের (হৃদি ক্ষত্রিয়) আন্দোলন বেশী দিন অস্পৃশ্যতা বর্জন. জমিদার বাড়িতে দৈহিক শ্রমের মাত্রা হ্রাস বা জমিতে স্বত্ব প্রতিষ্ঠার দাবিতে সীমাবদ্ধ থাকিল না। কতিপয় রাজনৈতিক কর্মীর নেতৃত্বে হৃদি ক্ষত্রিয়গণ নানকার প্রথারই অবসান দাবি করিলেন। চান্দের নগর, নাকসী, পাগুরভাঙ্গা, নথলা, বালিয়া শালিয়া, মোবারকপুর, কালীনগর, কলসপার, কদমতলী প্রভৃতি প্রায় ত্রিশটি গ্রামের পাঁচ শত সক্রিয় প্রতিনিধি তারাগড়-গ্রামে নানকার প্রথা উচ্ছেদের দাবিতে সম্মেলন করিলেন। প্রথমত নানকারী প্রজারা জমিদারদের নিকট লিখিতভাবে তাহাদের দাবি দাওয়া পেশ করিলেন। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকটও তাহারা উক্ত দাবিপত্রের অনুলিপি পাঠাইলেন। নানকারী প্রজাদের দাবি ছিল :—

১। নানকারী প্রথার অবসান।

২। নানকারী জমির উপর মৌজা ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নিরিখের অনুরূপ খাজনা ধার্য।

৩। অনুমোদিত দাখিলা দিয়া নানকারী প্রজা বা রায়তদের নিকট হইতে খাজনা আদায়।

৪। মালিক-বাড়িতে বিশেষ ক্ষেত্রে ও সময়ে নিম্ন শর্তে শ্রম দান করা যাইতে পারে :—

(ক) মন্দিরে প্রবেশ ও অঞ্জলি প্রদানের অধিকার স্বীকার।

(খ) কেবল পদ্মফুল, বেলপাতা, দেবদারুপাতা সংগ্রহ নয়, সব রকম ফুল তোলার অধিকার প্রদান।

(গ) মন্দিরে প্রবেশাধিকার না দিলে পূজা পার্বণ সম্পর্কিত কোন কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজ এমনকি বিসর্জনের জন্য প্রতিমা বহন করা হইবে না।

১৯৩৮ সালের জুন, জুলাই, আগস্ট এই তিন মাস ব্যাপক ভাবে সভা, বৈঠক, শোভাযাত্রা ও জমিদারদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলিল। কিন্তু কোনই ফল হইল না। বরং জমিদারগণ সরিয়াবাড়ি, বাহাদুরাবাদ প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে কয়েকশত বিহারী কুলি ও দাঙ্গাবাজ হিন্দু-মুসলমান লাঠিয়াল আমদানী করিল। তাঁহারা গোপনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিস সুপারিন-টেণ্ডেণ্টের নিকট শান্তিভঙ্গের আশঙ্কার কথা আনাইয়া জরুরী তার যোগে সশস্ত্র পুলিস বাহিনী প্রেরণের প্রার্থনা করিল। অন্যদিকে আবার প্রচুর পরিমাণে বন্দুকের কার্তুজ, বুলেট মজুত করিল এবং অতীত যুগের ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, বল্লম, খড়্গ, রামদা প্রভৃতি রঙ্গীন কাপড়ে ঢাকিয়া সেইগুলি ভাড়া করা কিছু লোকজন লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করিল। নানকারীদের গ্রামে গ্রামে প্রচার করা হইল যে জমিদারদের তরফ হইতে প্রয়োজন হইলে বন্দুক চালানো হইবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। এইভাবে প্ররোচনা ও উত্তেজনা চরমে উঠিল। নানকারী প্রজারা বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধভাবে তাহাদের নিজেদের তৈরী সব রকমের মারাত্মক অস্ত্র লইয়া হাজারে হাজারে জাঠা মার্চ করিল। জমিদারগণ প্রমাদ গণিলেন, তাহাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। শতাধিক বৎসর আগেকার সেই পাগল বিদ্রোহ ও হদি ক্ষত্রিয় নেতা জানকু পাথর ও দুবরাজ পাথরের নেতৃত্বে কৃষক-সংগ্রামের কথা হয়ত মনে পড়িল। জমিদারগণ তখন সরাসরি আক্রমণের পথ ছাড়িয়া হীন চক্রান্ত ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির ক্রূর পথের আশ্রয় লইল। ১৯৩৮ সালের শরৎকালীন উৎসব চরম উত্তেজনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইল। সক্রিয় প্রজারা সংঘবদ্ধভাবে আইনত না হইলেও কার্যত নানকারী প্রথার উচ্ছেদ করিল ; কেহই জমিদারবাড়িতে বেগার খাটিতে গেল না।

এই ভাবে ১৯৩৯ হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত নানকার আন্দোলন একটানা ভাবে চলে। আশ্রিত প্রজারা কেহই জমিদার বাড়ি দৈহিক শ্রম দিতে গেল না। জমিদারগণও নানকার জমির জন্য নগদ টাকায় খাজনা নিল না; জমি সম্পূর্ণভাবে চাষীদের দখলেই রহিল। জমিদারগণ তখন দাঙ্গাবাজ গুণ্ডা-শ্রেণীর মুসলমান চাষীদের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া নানকার জমি তাহাদের কাছে পত্তন দিবার চেষ্টা করিল। তাহাদের জমি দখল করিবার জন্য উৎসাহিত করিল। কিন্তু 'জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজ-লাঠিয়ালদের সাহায্যে উক্ত জমি দখল করার জন্য পর পর চেষ্টা করিয়াও ইহারা ব্যর্থ হইল। সেরপুর পরগনার জমিদারদের জমি দখলের কলঙ্কিত ইতিহাসে যে হুদি ক্ষত্রিয়রা ছিল লাঠিয়াল হিসাবে জমিদারদের সেরা হাতিয়ার ও সবচেয়ে বড় সহায়—যুগ পরিবর্তনে তাহারাই আজ ঐক্যবদ্ধ ভাবে রুখিয়া দাঁড়াইল নিজেদের জমি, বাড়ি দখলে রাখিবার জমিদার-বিরোধী সংগ্রামে। সত্যই ইতিহাসের ইহা এক নির্মম পরিহাস। শ্রেণীচেতনা উন্মেষের ফলে যুগে যুগে এমনিভাবেই দাসশ্রেণীর অস্ত্রের গতি পরিবর্তিত হয় প্রভুদের বিরুদ্ধে। এখানেও ঘটিল তাহাই। ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পর্যন্ত ক্ষত্রিয় চাষীদের এই সংগ্রামী সংকল্প ও একতা একদিনের জন্য শিথিল হয় নাই। জমির মালিকানা হইতে জমিদারদের উচ্ছেদ করিয়া কার্যত তাহারা নানকার প্রথার অবসান করিয়াছে।

ভাওয়ালী আন্দোলন

১৯৩৭-৩৮ সালে এই অঞ্চলে নূতন করিয়া জরিপের কাজ চলার সঙ্গে সঙ্গে ধানশাইল, কান্দুলী, ভটপুব প্রভৃতি গ্রামের রাজবংশী কৃষকগণ বলাই সরকাব ও কৈলাস সরকারের নেতৃত্বে ভাওয়ালী প্রথা উচ্ছেদের দাবিতে আন্দোলন শুরু কবিল। তাহারা ঐক্যবদ্ধভাবে সভা-মিছিল, ডেপুটেশন ও গণ-দরখাস্ত প্রভৃতি মারফৎ জমির মালিক সেরপুরের তালুকদাবদের জানাইযা দিল যে ভাওযালী জমির জন্য কবুলিয়তে উল্লিখিত টাকা ছাড়া তাহাবা অতিরিক্ত কোন দ্রব্য খাজনা বাবদ দিবে না। দুই বৎসর জোর আন্দোলন চলার পর ১৯৩৯ সালে ভাওয়ালী প্রথার অবসান হয়। ইহা প্রধানত রাজবংশী কৃষক সম্প্রদাযের আন্দোলন হইলেও এই অঞ্চলের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কৃষক সংগ্রাম।

সেরপুর পরগনার নানকার ও ভাওয়ালী প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাব সঙ্গে সঙ্গে সুসং পরগনায় চলিতেছিল টঙ্ক প্রথা উচ্ছেদের দাবিকে ভিত্তি করিয়া জমিদারদের রিজার্ভ বনে জ্বালানী কাঠ কাটা ও জলায় মাছ ধরার আন্দোলন। কাঠ কাটার অপরাধে ভরতপুর, লেঙ্গুরা অঞ্চলের কৃষকরা গ্রেপ্তার হইল। পাঁচগাঁও অঞ্চলে হাওড়ে মাছ ধরার সময়ে জমিদাররা গুলি চালাইল এবং পুলিসের সাহায্যে চাষীদের গ্রেপ্তার করা হইল। এই অঞ্চলের বিভিন্ন হাটে জমিদারদের জুলুম, অত্যাচারের প্রতিবাদে জনতা জমিদারদের হাট বয়কট করিল। হাতীপাগার প্রভৃতি গ্রামে তাহারা নিজেরা পাল্টা হাট বসাইল। এই ভাবে কৃষকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া লইয়া আন্দোলন চলার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে সারা ভারত কৃষকসভার সংগঠন

গড়িয়া উঠিল। ১৯৩৮ সালে ২৪শে ফেব্রুয়ারি বিখ্যাত কৃষকনেতা মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে ময়মনসিংহ শহরের উপকণ্ঠে কেওয়াটখালী ময়দানে জেলা কৃষকসমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইল। এই একই মঞ্চে ২৬শে ফেব্রুয়ারি বঙ্কিম মুখার্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইল জেলার প্রথম যুব সম্মেলন। এই ভাবে ভারত-বিখ্যাত দুই জন কৃষক-শ্রমিক নেতার মাধ্যমে ময়মনসিংহ পাহাড় সীমান্ত অঞ্চলের সংগঠন ও আন্দোলন সারা ভারত কৃষক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হইল।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইল। সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের শ্বেতাঙ্গ ভাইসরয় (বড়লাট) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে এক ঘোষণাদ্বারা ভারতবর্ষকে যুদ্ধে জড়াইয়া দিলেন। ভারতবর্ষের জনসাধারণ ছিল এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী। তাই বোম্বাইর লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এই যুদ্ধ ঘোষণার বিরুদ্ধে ধর্মঘট ও মিছিল করিয়া ভারতীয় শ্রমজীবী জনতার অভিমত ব্যক্ত করিল। স্পষ্টভাবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগঠিত গ্রামাঞ্চলের কৃষক সাধারণও তাহাদের মত ব্যক্ত করিল। সুসং ও নালিতাবাড়ির কৃষকরা প্রকাশ্য সভা, শোভাযাত্রা করিয়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলিল,—"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নিপাত যাউক"। শহরে শহরে পত্র-পত্রিকা ও পোস্টার মারফৎ ভারতীয় নাগরিকদের অভিমত জানানো হইল। কিন্তু ভারত সরকার তাহার যুদ্ধ ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য ভারতরক্ষা আইনের নাগপাশে প্রগতিশীল কর্মীদের গ্রেপ্তার ও অন্তরীণাবদ্ধ করিতে লাগিল। বিপ্লবী রাজনৈতিক নেতারা তখন আত্মগোপন করিয়া জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত ও জয়যুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হইলেন। এই সময় সুসং এলাকায় ললিত সরকার, বিপিন গুণ, পরেশ ও পদ্মলোচন প্রমুখ ১৫ জন এবং নালিতাবাড়ি এলাকার জামেশ্বর, জার্মান ভালু, বিরাট সরকার প্রমুখ ৭ জন আদিবাসী নেতা আত্মগোপন করিয়া যুদ্ধ ব্যবস্থা বানচাল করার জন্য সক্রিয়ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। তাহাদের প্রচার আন্দোলনের ফলে ভারত সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও এই অঞ্চলের জনসমর্থন লাভ করিতে পারিল না। ১৯৩৯-৪১ সাল পর্যন্ত পল্টনে ভর্তি করার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কোন রিক্রুট সংগ্রহে

সমর্থ হইল না। এমন কি পাদ্রি মিশনারীদের অনুরোধ পর্যন্ত আদিবাসী-গণ উপেক্ষা করিল। দ্বিতীয়তঃ, এই সময় যুদ্ধ-ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টাও তাহাদের প্রচার আন্দোলন ও সংগঠনের জোরে বানচাল হইল। যুদ্ধ-ভাণ্ডারে চাঁদা না দিলে চৌকিদারি ট্যাক্স লওয়া হইত না। ইহার ফলে পাঁচগাও, লেঙ্গুরা, জিগাতলা, ঘোষগাঁও, গাজির ভিটা, ভুবনকুড়া, কাকড়কান্দি, মণ্ডলীয়া পাড়া, মানপাড়া, পোড়াগাঁও, ঝিনাইগাতী, কাংসা প্রভৃতি ইউনিয়নের চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ হইয়া গেল লক্ষ্য করিয়া ভারপ্রাপ্ত সার্কেল অফিসারগণ ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে গোপন নির্দেশ দিতে বাধ্য হইলেন যে আদিবাসীদের ক্ষেত্রে যুদ্ধের চাঁদা না দিলেও যেন চৌকিদারি ট্যাক্স লওয়া হয়।

এই সব কাজকর্ম ছাড়াও, যেন যে কোন মুহূর্তে যাহাতে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটানো যায় সেইজন্য গোপন সংগঠন গড়িয়া তোলার কাজ করা হইত। রাজনৈতিকভাবে বিশ্বস্ত ও দুর্ধর্ষ কৃষকদের সম্ভবমতো সকল রকমের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার এবং হাত বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইত। গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব ও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার অনুশীলনের ব্যবস্থাও করা হইত। প্রায় ১০০০ হাজং, ডালু, কোচ, গারো, হদি প্রভৃতি কৃষককে গেরিলা যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। তাহা ছাড়া সাধারণভাবে সংগঠনের প্রায় সমস্ত বিশ্বস্ত কর্মীদের অস্ত্র ব্যবহারের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল। এমন কি মেয়েরাও অনেকে বন্দুক ও রাইফেল চালনা শিখিয়াছিল।

এই অঞ্চলে বিপ্লবী সংগঠনকে মোটামুটি নিম্নোক্তরূপে গঠন করা হইয়াছিল :—

সমগ্র অঞ্চলের জন্য সর্ব বিষয়ে যোগ্যতম ৭ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চতম কমিটি।

তাহার অধীনে পূর্ব (সুসং), পশ্চিম (নালিতাবাড়ি) ও মধ্য (হালুয়াঘাট) এই তিনটি আঞ্চলিক কমিটি।

১। পূর্ব আঞ্চলিক কমিটি :—সুসংএর অধীনে ছিল তিনটি এলাকা কমিটি।

(ক) মোহনপুর (শ্রীহট্ট জেলার বিশ্বম্ভরপাশা থানা) হইতে পশ্চিমে খাড়নৈ নদী পর্যন্ত **পাঁচ গাঁও** এলাকা কমিটি।

(খ) খাড়নৈ নদীর পশ্চিম তীর হইতে সোমেশ্বরীর তীর পর্যন্ত, **লেঙ্গুরা** এলাকা কমিটি।

(গ) সোমেশ্বরীর পশ্চিম তীর হইতে নিতাই নদী পর্যন্ত **চারুয়া পাড়া** এলাকা কমিটি।

২। পশ্চিম আঞ্চলিক কমিটি :—নালিতাবাড়ি কমিটির অধীনে ছিল চারটি এলাকা কমিটি।

(ক) পূর্বে হালুয়াঘাট থানার সীমা হইতে ভোগাই নদী পর্যন্ত **তন্তর** এলাকা কমিটি।

(খ) ভোগাই নদীর পশ্চিম তীর হইতে নন্নী পর্যন্ত **বোনারপাড়া** এলাকা কমিটি।

(গ) নন্নী হইতে ঝিনাইগাতী পর্যন্ত ছিল **বনকুড়া** এলাকা কমিটি।

(ঘ) ঝিনাইগাতী ইউনিয়নের সীমা হইতে এই জেলার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত **কাংসা** এলাকা কমিটি।

৩। মধ্য (হালুয়াঘাট) আঞ্চলিক কমিটির অধীনে ছিল দুইটি এলাকা সংগঠন।

(ক) নিতাই নদীর পশ্চিম পাড় হইতে দাহাপাড়া ফুলবাড়ী পর্যন্ত **ঘোষগাঁও** এলাকা কমিটি।

(খ) ঘোষগাঁও এলাকার সীমা হইতে পশ্চিমে নালিতাবাড়ী থানার সীমা পর্যন্ত **কুমারগাতী** এলাকা কমিটি।

এই সব আঞ্চলিক কমিটি ও এলাকা কমিটিগুলির দক্ষিণে কোন নির্দিষ্ট সীমা-রেখা ছিল না। যে কমিটি দক্ষিণে যতদূর তাহার সংগঠন বিস্তৃত করিতে পারিত তাহাই হইত উহার এলাকা। জেলা শহরে মূল কেন্দ্রে পৌঁছানো,—

দক্ষিণের সংগঠন ও আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হওয়াই ছিল উহার লক্ষ্য। উপর হইতে নীচ পর্যন্ত এই সংগঠনের কাজ ছিল প্রধানত দুই ধরনের—সামরিক ও বে-সামরিক।

সামরিক :—প্রত্যেকটি এলাকা কমিটিতে ১০০ হইতে ১২৫ জন পর্যন্ত সাধারণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ও সব রকমের অস্ত্র চালনায় শিক্ষিত গেরিলা থাকিত। ১০।১৫ বা উর্ধ্বে ২০ জন গেরিলা লইয়া এক একটি গ্রুপ বা দল থাকিত। প্রয়োজনমতো এই সংখ্যা কম বেশী করা হইত। এলাকা কমিটির এই গেরিলা দল ছাড়াও ১৯৪৫-৪৬ সালে এবং ১৯৪৯-৫০ সালে উচ্চ কমিটির পরিচালনায় আরও ৯টি সামরিক শিবির স্থাপন করা হইয়াছিল। অস্ত্র সংগ্রহ ও বোমা প্রস্তুতের কাজ ছিল এই উচ্চ কমিটির হাতে। প্রধানত এই বিভাগের কাজ ছিল :—

১। সময় ও সুযোগ হইলে যে কোন মুহূর্তে থানা, ইউনিয়ন বোর্ড, পোস্ট অফিস, সরকারী কোর্ট, আদালত, জমিদারদের কাছারী, মহাজনদের গদী ও গোলা দখল করা। ইংরাজ সরকারের বশংবদদের দালালদের বন্দী করা এবং গণ-আদালতের সামনে বিচার করা।

২। সর্বদা গ্রাম পাহারা দেওয়া, আক্রমণ হইলে শত্রুকে প্রতিরোধ করা, শত্রুর সংখ্যা বেশী হইলে সাঙ্কেতিক ভাবে অন্য গেরিলাদের আহ্বান করা এবং সমস্ত গ্রামবাসীদের শত্রুর আক্রমণ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা।

৩। শত্রুর ঘাঁটি ভাঙিয়া দেওয়া, একান্ত প্রয়োজন হইলে জ্বালাইয়া দেওয়া, সম্পত্তি দখল করা এবং অর্থ সংগ্রহ করা।

৪। পাহাড়ে, জঙ্গলে, প্রান্তরে, হাওড়ে গোপন আশ্রয়স্থল প্রস্তুত করা। মটর, জীপ, ট্রাক চলার রাস্তা, সেতু প্রভৃতি নষ্ট করিয়া দেওয়া।

৫। সব রকম গোপন সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করা। শত্রুপক্ষের গতি-বিধি লক্ষ্য করা ও সংবাদ সংগ্রহ করা।

বে-সামরিক :—এই বে-সামরিক বিভাগের কাজ ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত।

রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলন ও গ্রামে সংগঠন গড়িয়া তোলা এই বিভাগের প্রধান কাজ। এই জন্য গ্রাম্য বৈঠক, সভা, মিছিল, পোস্টার, ইস্তাহার বিলি করা, পুস্তক পুস্তিকা বিক্রয় করা হইত। গোপন ছাপাখানা (Printing Press) ও সাইক্লোস্টাইল মারফৎ ছাপার কাজ চলিত। প্রতি পনের দিন অন্তর একটি করিয়া "বুলেটিন" বাহির হইত।

এই বিরাট অঞ্চলের রাজনৈতিক সাংগঠনিক কাজের জন্য নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করা হইত। লেঙ্গুরার ললিত সরকার, কুমারগাতীর নারায়ণ মণ্ডল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ কেহ বা নিজেদের সমস্ত সম্পত্তি কেহ বা আংশিক সম্পত্তি সংগঠনের জন্য দান করেন। এই সব স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা ছিল সংগঠনের অন্যতম কাজ।

গ্রামে গ্রামে ঠিক সময়মতো জমি চাষাবাদ করানো, যাহাদের হাল বলদ নাই তাহাদের "গাতা" প্রথায় (self-helf) জমি চাষ করিয়া দেওয়া, 'মাগন কামলা' সরবরাহ করা, এবং অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা, উৎকৃষ্ট বীজ সরবরাহ করা, দুর্ভিক্ষের দিনের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন করা প্রভৃতি ছিল বে-সামরিক সংগঠনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ।

তাহা ছাড়া কাজ ছিল, সারা অঞ্চলের জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন, ঔষধ ব্যবহারের প্রচলন, এবং গ্রামের কর্মীদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবা করা শিক্ষা দেওয়া।

সাধারণ অবস্থায় ও সংগ্রামের সময় অঞ্চলের সর্বত্র ও বাহিরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা এবং সেইজন্য যানবাহন, ঘোড়া, সাইকেল ও নৌকার ব্যবস্থা করা ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নৌকাই ছিল প্রধান ও নিরাপদ যান। এই সংগঠনের ছোট নৌকা ছিল বারোটি এবং বড় নৌকা ছিল চারটি। প্রয়োজনমতো খাদ্য ও রসদ লইয়া বিপ্লবী কর্মীরা মাসের পর মাস নৌকায় থাকিতেন। দিগন্ত প্রসারিত ভাটি অঞ্চল ছিল ইহাদের আত্মরক্ষার একটি প্রধান ঘাঁটি।

সারা অঞ্চলে বিচার বিভাগ ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও আদর্শস্থানীয়। গ্রাম্য মামলা মোকদ্দমা প্রায় সমস্তই এই বিচারালয়ে নিষ্পত্তি করা হইত। এমনকি ঘুষ লওয়া, মিথ্যা দাখিলা, ট্যাক্সের রসিদ দেওয়ার দরুণ সরকারী কর্মচারী, জমিদার কর্মচারীদের, চোরা কারবারী মহাজনদেরও এই জন-বিচারালয়ে বিচার করা হইত। পাঁচ হইতে সাত জন নির্বাচিত বিচারক উপস্থিত থাকিতেন। সপ্তাহে দুই দিন কোর্ট বসিত। বাদী বিবাদী উভয় পক্ষের প্রতি নোটিশ জারি হইত এবং নির্দিষ্ট দিনে উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া এবং সাক্ষী সাবুদ লইয়া অধিকাংশ বিচারকের সিদ্ধান্তমতো রায় দেওয়া হইত। লেঙ্গুরা, কুমারগাতী ও মধ্যমকুড়ার বিচারালয় ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈকুণ্ঠ গুণ, রাজকুমার সরকার ও দীগেন্দ্র সরকার ছিলেন জনপ্রিয় বিচারক। এই বে-সামরিক বিভাগের আর একটি প্রধান কাজ ছিল সমস্ত রকম বিষয়ে অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করা; সরকারী আদালত ও জমিদারের কাছারীতে কৃষকদের স্বার্থে তদ্বির তদারক করা। গারো প্রগতিশীল যুবকদের "আচিক সংঘ" এই সময় নির্বাচিত কমিটিগুলির সঙ্গে একযোগে কাজ করিয়াছে।

১৯৩৬ সনে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনের সূচনা হইতে ১৯৫০ সন পর্যন্ত এই বিরাট অঞ্চলে যে গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার সমস্ত দিকের পরিচয় জানা এবং সম্যক রূপে প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে ইহা ছিল এক অভূতপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য গণ-সংগ্রাম ও গণ-সংগঠন।

১৯৪১ সনের জুন মাসে হিটলারের নাৎসী বাহিনী সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করিল। ফলে এই ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট-ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইল। এই মৈত্রীর মধ্য দিয়া ফ্যাসিস্ট পদানত ও আক্রমণাশঙ্কায় সন্ত্রস্ত পৃথিবীর জন-গণের এক ফ্যাসিস্ট বিরোধী মৈত্রী গড়িয়া উঠিল। যুদ্ধের মূল চরিত্রই পরিবর্তিত হইয়া গেল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ রূপান্তরিত হইল বিশ্বের স্বাধীনতা

যুদ্ধে। অপরদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতা সারা বিশ্বে প্রকট হইয়া পড়িল, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতা তাহার দুর্বল হাত হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল।

১৯৪২ সনে এই অঞ্চলের উচ্চ নেতৃত্ব এই আংশিক শাসন-সংস্কার বহির্ভূত এলাকাকে মুক্ত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। এবং সেই অনুযায়ী সমস্ত সংগঠনকে প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দিলেন। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে দক্ষিণের সমস্ত প্রগতিশীল ও বিপ্লবী সংগঠনের সক্রিয় সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মগোপনকারী দুইজন নায়ক শহর অভিমুখে রওনা হইলেন। কিন্তু পথে জনৈক গোপন আশ্রয়-দাতার বিশ্বাসঘাতকতায় তাহারা উভয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া জেলে আবদ্ধ হইলেন। ইতিপূর্বে আরও একজন নেতাও গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। উচ্চ কমিটির এই তিনজন বিশিষ্ট নায়ক হঠাৎ ধরা পড়িয়া যাওয়ায় পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই অঞ্চলকে প্রকাশ্যে মুক্ত এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইল না। সারা অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বৈঠক সভা করিয়া গোপন ইস্তাহার বিলি করিয়া কার্যত মুক্ত এলাকা গঠনের সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেওয়া হইল। বাস্তব ক্ষেত্রে বিপ্লবী কর্মসূচী ও বলিষ্ঠ সংগঠনশক্তির জোরে এই অঞ্চলকে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র ও জমিদার মহাজনদের শোষণ মুক্ত এক স্বাধীন স্বতন্ত্র মুক্ত এলাকারূপে প্রতিষ্ঠা করা হইল। সংগঠনের প্রত্যেকটি কাজের পিছনে জনসাধারণকে অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকিবার জন্য আহ্বান করা হইল। এই অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও জনগণের সমস্ত রকম কাজকর্মে বিপ্লবী কমিটিগুলি কর্তৃত্ব করিতে লাগিল। সরকারের থানা পুলিশ সাক্ষী-গোপালের মতো দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক ক্ষেত্রে জনগণের নির্বাচিত কমিটিগুলির নিকট আত্মসমর্পণ করিল এবং তাহাদের নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য হইল। বাস্তবক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতা অনগ্রসর জনতার মধ্যেও প্রকাশ পাইল। এই অঘোষিত মুক্ত এলাকার মধ্যে আত্মগোপনকারী কর্মীরাও

প্রকাশ্যভাবে বিচরণ করিতে লাগিল। এই অঞ্চল হইতে অত্যাচারী জমিদার, কর্মচারী, মহাজন, দালালশ্রেণীর দুষ্ট লোকেরা ভয়ে শহরে পলাইয়া গেল। সুসং ও সেরপুরের জমিদারগণ এই অঞ্চল হইতে কার্যত প্রায় উচ্ছেদ হইয়া গেল। এই অঞ্চলের প্রজাদের নিকট হইতে টংক ধান ও খাজনা আদায় করিতে না পাবায় তাহারা কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের নিরাপদ আশ্রয় লইল। আংশিক শাসন-সংস্কার বহির্ভূত এলকায় সমস্ত রকম প্রশাসনিক দায়িত্ব আদিবাসীদের বিপ্লবী কমিটি তথা জনসাধারণই গ্রহণ করিল। উত্তর ময়মনসিংহের পাঁচটি থানার উত্তরাংশে জনগণেব পরিচালিত অঘোষিত মুক্ত এলাকায় একটি প্রায় স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সরকার অপর দিকে সমগ্র দক্ষিণ অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকার, পাশাপাশি চলিতে লাগিল ।

১৯৪২ সনের মার্চ হইতে ১৯৪৫ সনের জানুয়ারী পর্যন্ত হাজং, ডালু, গারোদের পুরোভাগে রাখিয়া জনগণের সরকার ঐ অঞ্চলের সমস্ত রকম শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগে ময়মনসিংহ জেলার জনসাধারণ এমনকি ইংরাজ সরকারের একান্ত বশংবদরা পর্যন্ত সাগ্রহে ও সবিস্ময়ে লক্ষ করিল যে যখন সমস্ত বাংলা দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ, ঘুষখোরী দুর্নীতিপরায়ণতা, অত্যাচার উৎপীড়ন ও ভীষণ মহামারী চলিতেছে, তখন এই মুক্ত আদিবাসী এলাকায় সাধারণ কৃষক সন্তানরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বচ্ছন্দে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালাইতেছে। এখানে সাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি লইয়া চোরাকারবারী ও মজুতদারী চলে নাই। যুদ্ধজনিত এই দুর্ভিক্ষ মহামারীর যুগে এখানে একটি প্রাণও অনাহারে নষ্ট হয় নাই, হাজার হাজার মন ধান ধর্মগোলায় সংগৃহীত হইয়া অভাবীদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। এবং অঞ্চলের প্রয়োজন মিটাইয়া উদ্বৃত্ত খাদ্য বাহিরে পাঠানোর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সুসং, হালুয়াঘাট, নালিতা-বাড়ী হইতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংলগ্ন দক্ষিণ অঞ্চলের বুভুক্ষুদের মধ্যে ধান, চাউল, লবন, কেরোসিন প্রভৃতি ন্যায্য দরে বিক্রয়

বা বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দক্ষিণে কংস ও ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট অঞ্চলে এমনই এক অভিনব রাজত্ব সকলেই বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিল। গারাম পাড়া, চৈতন্যনগর ঘোষগাঁও, নাগের পাড়া মধ্যমকুড়া, তন্তর বোনারপাড়া, পোড়াগাঁও, নলকুড়া, কান্দুলী, কাংসা প্রভৃতি ছিল এই অঞ্চলের এক একটি বিশিষ্ট কর্মকেন্দ্র। কুমারগাতীর গণ-আদালত ও ধর্মগোলা, লেঙ্গুরার সামরিক সংগঠন এবং নালিতাবাড়ীর খাদ্য সরবরাহ বিভাগ ছিল সমস্ত শ্রেণীর জনসাধারণের অত্যন্ত গর্বের বিষয়। এই অঞ্চলের জনগণই খনন করিয়াছে ফসল উৎপাদনের জন্য চণ্ডীগড়ের খাল, ভুবনকুড়ার দীঘি এবং রচনা করিয়াছেন হরিনাকুড়ী ও নয়াবীলের বাঁধ। কৃষক সমিতির কর্তৃত্বে পাঁচগাও, ভরতপুর, মধ্যমকুড়ায় ও কাংসায় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। জনগণের পরিচালিত ভটপুরের হাইস্কুল আজও সারা এলাকার গর্বের বিষয়। জেলা বোর্ডের ডাক্তার, স্যানিটারী ইন্‌সপেক্টার ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের কর্মচারীগণ জনগণের নির্বাচিত কমিটির নির্দেশে সহজে ও সানন্দে কাজ সম্পন্ন করিত।

ব্রিটিশ শাসনমুক্ত অঞ্চল রূপে দাঁড়াইলেও এই এলাকা নিখিল ভারত ও বহির্জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন তো হয়ই নাই বরং গভীর সংযোগ রক্ষা করিয়াছে। তাই এই সময় জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও স্বাধীন জাতীয় সরকারের দাবি করিয়া নালিতাবাড়ী ও সুসংএ ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলন ও প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সব সম্মেলনে বিশ্ব-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করা হয়। ধেনকানাল, তালচের, আস্তি-চিমুর ও মালাবারের কায়ুর শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শুধু তাহাই নহে ১৯৪৫ সনে নেত্রকোণায় যে সারাভারত কৃষক সভার নবম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে এই মুক্ত এলাকার আদিবাসী কৃষককর্মীদের অবদান ছিল অপরিসীম ও আদর্শস্থানীয়।

যুদ্ধোত্তর যুগে গণ-অভ্যুত্থান

ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাজয় ও সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে বিশ্ব জনগণের বিজয়ের মধ্য দিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটিল। ধ্বংসোন্মুখ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতা এই যুদ্ধে নগ্নভাবে প্রকটিত হইল। সারা বিশ্বে তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হইলেও ভারতবর্ষের উপর শেষবারের মতো সন্ত্রাস নীতি চালাইতে চেষ্টা করিল। ব্যাস্টিন সাহেবকে পাঠানো হইল ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রূপে। মিঃ ব্যাস্টিন যুদ্ধ ফেরত সাজ সরঞ্জাম ও অলস সামরিক বাহিনীর সাহায্যে উত্তর অঞ্চলের ব্রিটিশ শাসন মুক্ত অঞ্চলকে পুনরায় করায়ত্ত করার জন্য তৎপর হইল। প্রথমে ভৈরব ছত্রপুর ও উস্তুগঞ্জের মিলিটারী ক্যাম্প হইতে তিনটি দলে সৈন্যদের গারো পাহাড়ের জঙ্গলে শিকার করা এবং খ্রীষ্টিয় মিশনগুলি দেখার অজুহাতে পাঠানো হইল। এই সৈন্যগণ রানীকং, বিরুইডাকিনী, বাওয়াই বাদা প্রভৃতি রোমান ক্যাথলিক মিশনগুলিকে কেন্দ্র করিয়া এই অঞ্চলে ভৌগলিক অবস্থা (Topography) সংক্রান্ত যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহ করিল। বিশেষ বিশেষ গ্রামগুলির অবস্থান লক্ষ্য করিল। ইহার সপ্তাহকাল মধ্যেই থানাগুলিতে সিপাহী সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইল এবং ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স জমিদারের টঙ্ক ধান ও মহাজনদের বাকি বকেয়া সাকুল্য টাকা আদায় করার জন্য নোটিশ ও সার্টিফিকেট জারী করা হইল। অঞ্চলের বিশিষ্ট কর্মীদের নামে নূতন করিয়া গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হইল।

এলাকার সমস্ত কৃষকগণ ইহার উত্তরে জানাইয়া দিলেন যে চারি বৎসর পূর্বে কৃষকরা যে টঙ্ক প্রথা রদ করিয়াছেন, মহাজনদের ঋণ পরিশোধ বন্ধ

করিয়াছেন তাহা আর দেওয়া হইবে না। বিগত পাঁচ বৎসর এই অঞ্চল যে ভাবে চলিয়াছে সেই ভাবেই চলিবে।

এই সময় হঠাৎ সমগ্র দক্ষিণ দিকে "ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীকে" সমাবেশ করা হইল এবং যুগপৎ উত্তরে গারো পাহাড়ে সমাবেশ করা হইল "আসাম রাইফেল বাহিনীকে"। মহেন্দ্রগঞ্জ, পোড়াকাশিয় বারেঙ্গাপাড়া, শিববাড়ী রাঘমারা জগন্নাথপুর ও মহিষ খোলাতে আসাম রাইফেল বাহিনীর ক্যাম্প বসিল। জনতার মুক্ত এলাকা এইভাবে যুগপৎ উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে পরিবেষ্টিত হইল। এই সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিপ্লবী কমিটি যেখানে যেখানে সম্ভব ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া সশস্ত্র প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল এবং জনসাধারণকে নির্ভীক ও শান্তভাবে গ্রামে থাকিতে নির্দেশ দিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গোপন শত্রু রোমান ক্যাথলিক মিশনারীরা তখন খ্রীষ্টান কৃষকদের ইংরাজ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতে নির্দেশ দিল এবং আদিবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টা শুরু করিল। যুদ্ধ ফেরত ঘোড়া ও জীপে চড়িয়া গ্রামে গ্রামে এই মিশনারীরা ব্যাস্টিনের পক্ষে দালালী শুরু করিল। ফলে এই অঞ্চলের কিছু কিছু গ্রাম ব্যাস্টিনের দখলে চলিয়া গেল এবং এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিল সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী। তাহারা সংগঠিত গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ চালাইল এবং প্রায় ১০০টি সংগঠিত গ্রাম ভাঙিয়া তচনচ করিল অথবা আগুন জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দিল। ব্যাস্টিনের হুকুমে সৈন্যবাহিনী ধর্মগোলার হাজার হাজার মণ চাষীদের ব্যক্তিগত ধান, চাল, গরু, মহিষ, থালা, ঘটি, বাটী নগদ টাকা পয়সা গহনা পত্র যাহা পাইল তাহাই লুঠ করিল। শুধু তাহাই নহে তাহারা নষ্ট করিল কৃষক মা বোনদের ইজ্জত, প্রকাশ্য দিবালোকে আগুনে পোড়াইয়া দিল কৃষকদের পূজার ঘর, সমিতির ঘর, পাঠশালা ও চিকিৎসালয়।

এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলা ও অত্যাচারের তাণ্ডবের মধ্যেও কিন্তু বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন চাষীরা গ্রাম ত্যাগ করিল না। সুযোগ ও সুবিধা মতো তীর,

ধনুক, বেওয়ার, বল্লম ও দা লইয়া ইংরাজ শক্তিকে প্রতিরোধ করিতে লাগিল। এই সময় সুসং পশ্চিম এলাকা কমিটির পুরোভাগ আসিয়া দাঁড়াইলেন বর্ষিয়সী হাজং মাতা রাসমণী ও মাইজপাড়ার সুরেন্দ্র। রাসমণী একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়িয়া গ্রামে গ্রামে মেয়েদের প্রতিরোধ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈন্যদের রাইফেল, স্টেনগান, ব্রেনগান ও মেসিনগানের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল শিখাইতে লাগিলেন। হঠাৎ কোন গ্রাম আক্রান্ত হইলে তিনি তাহার বাহিনীসহ গ্রামবাসীদের প্রতিরোধে সাহায্য করিতেন।

১৯৪৬ সনের ৩১শে জানুয়ারী একদল সৈন্য সোমেশ্বরী তীরে বহেরাতলী গ্রামে প্রবেশ করিল। গ্রামের পুরুষরা তখন সবাই অনুপস্থিত। এই সুযোগে বর্বর সৈন্যরা দুইটি হাজং মেয়ের ইজ্জৎ নষ্ট করিল। দুই জন সৈন্য কৃষকবধূ সরস্বতীকে টানিয়া পশ্চিমের জঙ্গলের দিকে লইয়া চলিল। সরস্বতী আর্তনাদ করিয়া সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিল। বহেরাতলী গ্রামে সৈন্যরা প্রবেশ করিয়াছে এই সংবাদ ইতোমধ্যে বিপ্লবীদের গোপন কেন্দ্রে একদল জঙ্গী পৌঁছাইয়া দিয়াছে। পাশে ছনগড়া গ্রামে জঙ্গীরা তখন আহারের অপেক্ষায় বিশ্রাম করিতেছিল। রাসমণীর নেতৃত্বে পাঁচ ছয় জন মহিলা আত্ম-রক্ষা সমিতির কর্মীও সেই সঙ্গে ছিল। মুহূর্ত মধ্যে লাঞ্ছিতা সরস্বতীর কাতর আর্তনাদ ও বহেরাতলী গ্রামবাসীদের আহ্বান রাসমণীর কানে আসিয়া পৌঁছিলে তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। অত্যাচারিতা সরস্বতীর করুণ-আর্তনাদ জঙ্গী বাহিনীর সমস্ত ক্লান্তি ও ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা ভুলাইয়া দিল। ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বিশিষ্ট-গেরিলা নেতারা তখন পরামর্শ করিতেছেন প্রকাশ্যভাবে আক্রমণ করা ঠিক হইবে কিনা। রাসমণী ও তাহার মেয়ে জঙ্গীরা কিন্তু এই সব চুলচেরা বিচারের অপেক্ষা করিলেন না। তাহারা নিঃশব্দে তুলিয়া লইল—দা, বেওয়ার, রক্তপতাকা।

জঙ্গী সাথীদের আহ্বান করিয়া সে বলিল "ময় তিমাৎ, তিমাতের ইজ্জৎ

রক্ষা করিব, নাতে মরিব, তরা নীতি লইয়া বইয়া থাক্‌" ; এই কথা বলিয়া রাঁসমণী বহেরাতলীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তাহার সঙ্গে গেলেন আরো দশ বারো জন। বিশিষ্ট জঙ্গী নেতা সুরেন্দ্র তখন পঁচিশ জন জঙ্গীর একটি বাহিনী লইয়া দক্ষিণ দিক হইতে রাসমণীর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। রাসমণী তাহার জঙ্গীদের লইয়া উত্তরে বিজয়পুরের দিক হইতে সশস্ত্র সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হইলেন। সোমেশ্বরীর শুষ্ক বালুকাময় পশ্চিম তীরে সৈন্যেরা এই ভাবে দুই দিক হইতে অবরুদ্ধ হইল। পূর্বে সোমেশ্বরীর তীব্র স্রোত সহজে পার হওয়া তাহাদের পক্ষে সুকঠিন। ভীত সৈন্যেরা তখন সরস্বতীকে ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বাধা পাইল সোমেশ্বরীর বালুচরে। ইতোমধ্যে রাসমণী ও সুরেন্দ্র বাহিনীর সৈন্যদের লক্ষ করিয়া তীর বর্শা ও পাথর ছুঁড়িতে লাগিল। বিপযস্ত সৈন্যদল দিকবিদিক জ্ঞানশূণ্য হইয়া এলোপাথারি গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। কিন্তু গুলি উপেক্ষা করিয়া রাসমণীর বাহিনী সৈন্যদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং দাও, চেওয়ার দিয়া আঘাতের পর আঘাত করিতে লাগিল। সৈন্যদের গুলিতে কয়েকজন চাষী আহত হইল। তাহাদের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গিনী মূর্তিতে দা চালাইতে লাগিলেন বীরাঙ্গনা রাসমণী আর তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া দক্ষহাতে বর্শা চালাইতে লাগিলেন সুরেন্দ্র। যে সৈন্যটি সরস্বতীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল রাসমণী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দায়ের এক কোপ বসাইয়া দিলেন। দায়ের এক আঘাতেই সৈন্যের মুণ্ড দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। পাশের সৈন্যটি রাসমণীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। রাসমণীর দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িল। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে সুরেন্দ্র তাহার বর্শাদ্বারা এই নারীহত্যাকারী সৈন্যটির বক্ষ বিদীর্ণ করিলেন। পরমুহূর্তেই একটি বুলেট সুরেন্দ্রকে শহীদের মৃত্যুদান করিল। সুরেন্দ্রের প্রাণহীন দেহ মাতা রাসমণীর কোলেই লুটাইয়া পড়িল। এই ভাবে প্রায় তিন ঘন্টাকাল লড়াই চলিল।

বিদ্রোহী চাষীদের রক্তে রঞ্জিত হইল সোমেশ্বরীর নীল জল ; আর নারীঘাতী

ব্যাস্টিনের সৈন্যদের কলুষিত রক্তধারায় তৃপ্ত হইল সোমেশ্বরীর শুষ্ক তৃষিত বালুকারাশি। সৈন্যদের মধ্যে দুই জন নিহত ও কমবেশী দশ জন আহত হইল। অপরদিকে বিদ্রোহীরা হারাইল বীরমাতা রাসমণী ও সুরেন্দ্রকে। এই দুই বিপ্লবীর মৃত্যুর বিনিময়ে এই অঞ্চলের সংগ্রামী চাষীরা অর্জন করিল সশস্ত্র যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আর লাভ করিল ১টি রাইফেল ও ১টি স্টেনগান। বাংলা তথা ভারতের মুক্তি আন্দোলনে হাজং রমণী রাসমণীর এই সশস্ত্র সংগ্রাম যেমন অতুলনীয় ও অনন্যসাধারণ তেমনই গৌরবোজ্জ্বল। ভারতের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নারী জাতির ক্ষেত্রে ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর পর রাসমণীর মতো সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল। লক্ষ্মীবাঈ দীর্ঘ বিস্মৃতির পর আজ তাহার যোগ্য সম্মান পাইয়াছেন। কৃষক রমণী রাসমণীকে আমরা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের শহীদ বীরাঙ্গনারূপে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিব আর কতদিন পরে? এই দুই বিপ্লবীর মৃত্যুর বিনিময়ে এই অঞ্চলের জনতার আন্দোলনে এক গুণগত পরিবর্তন সূচিত হইল।

এই সময় জেলার সর্বত্র তথা সারা বাংলায় চলিতেছিল বর্গা চাষীদের তে-ভাগা আন্দোলন। শহীদ রাসমণী ও সুরেন্দ্রের আত্মবলিদান এই তে-ভাগা আন্দোলনে এক অভিনব অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিল। বর্গাচাষীরা কায়েমী স্বার্থের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনমতো সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম করার পথনির্দেশ পাইল। ফলে এই বিরাট তে-ভাগা আন্দোলন বাংলার কৃষি-বিদ্রোহে এক অমর ইতিহাস রচনা করিল।

তারপর ১৬ই ফেব্রুয়ারী রশিদ আলী দিবস। চারিদিকের গ্রাম হইতে ছোট বড় দলে ভাগ হইয়া জনতা নালিতাবাড়ী বন্দরে আসিতে লাগিল সেই দিবস পালনের উদ্দেশ্যে। গ্রামের পথে পথে ব্যাস্টিনের সৈন্যদল এই সব জনতাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য সৃষ্টি করিল নানা ধরনের বাধা। বন্দুক ও বেয়নেটের ভয় দেখাইল। উপর হইতে এরোপ্লেনে ছোঁ মারিয়া সমিতির বাড়ির উপর উড়ানো ঝাণ্ডা ভাঙিয়া দিল। মিছিলের

উপর বার বার ছোঁ মারিল। তবুও জনতার অভিযান রোধ করা গেল না। প্রায় দশ বারো হাজার জনতা নালিতাবাড়ি পৌঁছিয়া রশিদ আলীর মুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করিল।

পরের সপ্তাহেই আসিল ঐতিহাসিক নৌ-বিদ্রোহের সংবাদ। ঐ সংবাদকে ভিত্তি করিয়া ময়মনসিংহ শহরের কয়েকটি সরকারী অফিস গৃহ বিক্ষুব্ধ জনতা আগুনে পুড়াইয়া দিল। সদরে জনতার গণ-অভ্যুত্থান শুরু হইয়াছে, কোর্টে পুলিশের গুলি চলিতেছে—এই সংবাদ এই অঞ্চলে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ভূপেন ভট্টাচার্য তিন হাজার জনতার এক শোভাযাত্রা লইয়া হালুয়াঘাট অভিমুখে রওনা হইলেন। মিশনারী পাদ্রীরা ভীত হইয়া কিছু সংখ্যক অন্ধ সমর্থকদের দা, কুড়াল, চেওয়ার ও বন্দুক দিয়া চার্চ রক্ষা করার জন্য দাঁড় করাইলেন। কিন্তু প্রতিবেশী হাজং ডালুদের প্রতিশ্রুতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ কথা শুনিয়া দেশপ্রেমিক খ্রীষ্টানগণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সর্বনাশা পথ হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দীর্ঘ শোভাযাত্রা নৌ-বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি তুলিয়া স্বাধীন ভারত ও মুক্ত এলাকার আওয়াজ দিয়া সন্ধ্যায় এক বিরাট সভা করিল। ফেরার পথে জনতা বিজয়োল্লাসে থানা জমিদার কাছারী ও মহাজনদের গদির উপর মুক্তি-ঝাণ্ডা উড়াইয়া দিল।

যুদ্ধোত্তর যুগের টঙ্ক চাষীদের এই গণ-অভ্যুত্থানে প্রাণ বলিদান করেন এক মধ্যবিত্ত যুবক নালিতাবাড়ির শচী রায়। এই অঞ্চলের গেরিলা বাহিনীর সে ছিল অন্যতম অস্ত্রশিক্ষক। শচী নিজ হাতে দেশী গাদা বন্দুক তৈয়ার করিত, বন্দুক ও রাইফেল মেরামত করিত। সর্বোপরি বিভিন্ন ধরনেব হাত-বোমা প্রস্তুত করার সে ছিল একজন দক্ষ কারিগর। একদিন হাত-বোমা তৈয়ার করার সময় হঠাৎ বিস্ফোরণে সে শহীদের মৃত্যুবরণ করে। আর তাহার সাথী পূর্ণ বিকালাঙ্গ হইয়া আজও সেই বিপ্লব প্রচেষ্টার স্মৃতি বহন করিতেছে। ইহার পর আসিল ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা দিবস। স্থানীয়

সুবিধা বিচার করিয়া এই দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত করা হইল চার দিন পিছাইয়া ৩০শে জানুয়ারী। স্থির হইল ঐ দিবস শহীদ রাসমণী ও সুরেন্দ্র দিবস হিসাবে প্রতিপালিত হইবে। সেই দিন ভোর হইতে না হইতেই গেরিলাগণ নিজ নিজ বর্শার মাথায় লাল ঝাণ্ডা বাঁধিয়া লাঠি হাতে সমবেত হইল চারুয়াপাড়ায় সুরেন্দ্র-রাসমণীর সমাধিক্ষেত্রে। সেখানে অনুষ্ঠান শেষ করিয়া তাহারা বিভিন্ন পথে প্রচারের জন্য রওনা হইল ঘোষগাঁও হাটের দিকে। এই হাটের দেড়মাইল দক্ষিণে ভালুকাপাড়া গির্জার সুমুখে অকস্মাৎ একদল সিপাহী জঙ্গীদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং প্রচার বাহিনীর নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়া কলসিন্দুর পুলিশ ক্যাম্পে লইয়া যাইবার জন্য জবরদস্তি আরম্ভ করিল। নেতারা প্রতিবাদ করিয়া পথ ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ জানাইয়া বলিলেন, "আমরা আজ বিরোধ করিতে আসি নাই। শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বাধীনতা দিবসের প্রচার করিতে আসিয়াছি"। জঙ্গীদলকে একেবারে নিরস্ত্র ও অসহায় মনে করিয়া সিপাহীরা তাহাদের বন্দুক ও বেয়নেটের ভয় দেখাইল এবং বন্দুকে সঙ্গিন পড়াইতে শুরু করিল। দক্ষ ও চতুর নেতা নয়ান তখন হাজং ভাষায় সাথীদের ঝাণ্ডা খুলিয়া বর্শা ধরিতে বলিল। এবং বিদ্যুৎগতিতে একজন সিপাহীর হাত হইতে রাইফেল ছিনাইয়া লইয়া তাহারই বুকে বেয়নেট বসাইয়া দিল। মুহূর্ত মধ্যে উভয় পক্ষে হাতাহাতি সংগ্রাম শুরু হইল। কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ ও বলিষ্ঠ চাষীদের হঠাৎ আক্রমণে সিপাহীরা দিশাহারা হইয়া ইতস্ততঃ ছুটিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আর এক জঙ্গীর বর্শার আঘাতে আর একজন সিপাহী ধরাশায়ী হইল। স্বাধীনতা দিবসে কৃষকদের এই শান্তিপূর্ণ প্রচার বাহিনী বাধ্য হইয়া এই ভাবে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইল। এই সংঘর্ষে তিন জন সিপাহী নিহত হইল ও দুটি রাইফেল জনবাহিনীর হস্তগত হইল। এই সম্পর্কে ভালুকাপাড়ার গির্জার পাদ্রী সাহেবের মন্তব্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলিয়াছিলেন", **Baheratali was a drawn game, but this one is**

definitey a winning fight for the insurgents both from the point of loss of lives and arms.

ঠিক এক বৎসর আগে বহেরাতলী সংগ্রামে বিপ্লবী কৃষকরা দুইটি প্রাণের বিনিময়ে দুইটি প্রাণ ও দুইটি আগ্নেয়াস্ত্র দখল করিয়াছিল। এইবার প্রাণ না দিয়াই দুইটি সিপাহীকে নিহত করিয়া দুইটি আগ্নেয়াস্ত্র দখল করিল। খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এই অঞ্চলের কৃষি-সংগ্রামের ইতিহাসে আর এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধকে করিল দীপ্ত ও গৌরবোজ্জ্বল।

ভারতের মুক্তি

তারপর ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিল। ভারত ও পাকিস্তান দুইটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হইল। সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে এই পাহাড় সীমান্ত অঞ্চলের আদিবাসী জনসাধারণও সেই দিন মুক্তি লাভে উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়া গ্রামে গ্রামে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকা ও লালঝাণ্ডা একত্রে উড়াইল। সেইদিন সুসং দুর্গাপুরের বৈকুণ্ঠ গুনের, হালুয়াঘাটে ধীরেন্দ্র সরকার ও রাজকুমার সরকারের, নালিতাবাড়িতে জামেশ্বর সরকারের এবং ভটপুরে রাজবংশী নেতা বলাই সরকারের নেতৃত্বে স্বাধীনতা দিবসে বিরাট বিরাট জনবাহিনীসহ শোভাযাত্রা ও সভা অনুষ্ঠিত হইল। এই নেতৃবৃন্দ অকুণ্ঠচিত্তে নবগঠিত পকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া অভিনন্দন জানাইলেন এবং রাষ্ট্রের কর্ণধারদের নিকট অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক কর্মীদের উপর হইতে বাধানিষেধ ও পরোয়ানা প্রত্যাহারের এবং বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আবেদন পেশ করিলেন।

বছর ঘুরিল, ফিরিয়া আসিল ১৯৪৮ সনের স্বাধীনতা দিবস, ১৪ই আগস্ট। তবুও এই অঞ্চলে তথা পূর্ব পাকিস্তানে জমিদারী প্রথা বিলোপের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। রাজনৈতিক কর্মীদের উপর হইতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা উঠিল না।

পূর্ব পাকিস্তানের মহামান্য লাট বাহাদুর মিঃ বারোজ এই সময় এই অঞ্চল পরিদর্শনে আসিলেন। বিজয়পুর বাংলোয় তিনি সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতি-নিধিদের সহিত এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিলেন। হাজং, ডালু, কোচ

গারো প্রভৃতি আদিবাসীগণও নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম লাট বাহাদুরকে অভিনন্দন জানাইলেন। এই সংগ্রামী জনতার পক্ষ হইতে জামেশ্বর ও চন্দ্র সরকার লাট বাহাদুরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের প্রার্থনা জানাইলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে এই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের আইন পাশ করিতে বিলম্ব ঘটার সম্ভাবনা থাকিলে এক বিশেষ আইন (Ordinance) জারী করিয়া জমিদারী প্রথা অবসানের ঘোষণা করার জন্যও তাঁহারা অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এক যুগ আগে একদা বাংলার হক মন্ত্রিমণ্ডলী কৃষকদের প্রতি ও রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি যে সমবেদনা ও উদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী সেটুকুও করিলেন না। বিপরীত পক্ষে তাঁহারা বরং জমিদারের টঙ্ক ধান ও বাকি বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডের সার্টিফিকেট জারী শুরু করিলেন এবং জবরদস্তিমূলক "লেভী" ধান (Procurement Departmant) আদায় আরম্ভ করিলেন। তাই ১৯৪৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে কৃষকগণ আবার হাটে বাজারে প্রকাশ্যে প্রচার করিতে বাধ্য হইল "টংক প্রথা ধ্বংস হোক, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হোক, জান দিব তবু ধান দিব না, এলাকার উদ্বৃত্ত ধান ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করা" প্রভৃতি। লীগ সরকার জনতার আশা আকাঙ্ক্ষা তো পূর্ণ করিলই না বরং ঐক্যবদ্ধ কৃষকদের দাবি উপেক্ষা করিয়া বলপূর্বক পুলিশের সাহায্যে টঙ্ক ধান ও লেভী আদায় করার নির্দেশ দিল। শুধু তাহাই নহে, লীগ সরকার সমস্ত কুখ্যাত গুণ্ডাদের ন্যাশনাল গার্ড ও আনসার বাহিনীতে ভর্তি করিয়া এই সশস্ত্র বাহিনীকে আদিবাসীদের গ্রামে গ্রামে অত্যাচারের সনদ দিয়া ছাড়িয়া দিল। এইবার এই আদিবাসীদের সংগ্রামী গ্রামগুলিতে শুরু হইল আনসার ও ন্যাশনাল গার্ড নামে কথিত দস্যুদের সীমাহীন অত্যাচার উৎপীড়ন এবং পাশবিকতার তাণ্ডব। নির্বিচারে প্রহার, অপমান, বেপরোয়া লুণ্ঠন, এমন কি

নারীধর্ষণ হইয়া দাঁড়াইল এইসব গ্রামের দৈনন্দিন ব্যাপার। জনতার বুকে তাই ধূমায়িত হইল প্রচণ্ড বিক্ষোভের আগুন।

লীগ সরকারের এই হৃদয়হীন ও জনবিরোধী শাসননীতি শান্ত পাহাড় অঞ্চলকে ও তার শান্তিপ্রিয় আদিবাসীদের আবার করিয়া তুলিল অশান্ত ও উদ্বেলিত। স্বাধীন মাতৃভূমিতে সৎ নাগরিক হিসাবে সুখে শান্তিতে বসবাস করার এবং দেশ ও জাতিকে মনের মতো করিয়া গঠন করার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন ও আশা আকাঙ্ক্ষা তাহাদের ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেল। দীর্ঘ দিনের নির্যাতিত শোষিত চাষীদের আবার কঠিন সংগ্রামের দুর্গম পথে নামিতে বাধ্য করা হইল।

১৯৪৯ সনের ৮ই জানুয়ারী। কলমাকান্দা থানার চৈতন্যনগরের নিলচাঁদ হাজং এর ২০ মণ টঙ্ক ধান লইয়া যাওয়ার সময় গ্রামবাসীরা বাধা দিল এবং এই ধান কাড়িয়া লইয়া আবার নিলচাঁদের গোলায় তুলিয়া দিল। জমিদারের লোকজন ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল। ধান রক্ষার এই সাফল্যের সংবাদ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে জনতার মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল এবং ইহা কেন্দ্র করিয়া সমগ্র অঞ্চলে প্রায় ১০০ শত প্রচার বাহিনী বাহির হইল। হাটে বাজারে, গ্রামের পথে পথে আওয়াজ উঠিল,—"টঙ্ক নাই", "আধি নাই", "গরিব চাষীর উপব লেভী নাই" "ফসলের উপর চাষীর অধিকার" "ফসল কেটে ঘরে তোল দখল রেখে চাষ কর" "জান দিব তবু ধান দিব না" ইত্যাদি। বনের আগুনের মতো সর্বত্র এইসব আওয়াজ ছড়াইয়া পড়িল। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান জনসাধারণ অকুণ্ঠভাবে প্রচার বাহিনীকে অভিনন্দন জানাইল। যুদ্ধোত্তর যুগের বিপ্লবী সংগ্রামের স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিল।

১৫ই জানুয়ারী বটতলা গ্রামের টঙ্ক ধান আটক পড়িল। সংবাদ পাইয়া পরদিন কলমাকান্দা থানার দারোগা ছয় জন সশস্ত্র পুলিস, সাত জন চৌকিদার ও উনিশ জন আনসার সহ বটতলা হামলা করিল। পাঁচ জন চাষীকে গ্রেপ্তার করিয়া নির্মম প্রহার করায় জনৈক দুর্বল চাষী উক্ত ধানের সন্ধান বলিয়া দিল।

দারোগা তখন সেই ২৫ মণ টঙ্ক ধান দুইটি গরুর গাড়িতে বোঝাই করিয়া রওয়ানা হইতেই চাষীরা সম্মিলিতভাবে আপত্তি জানাইল ও গাড়ির পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। আনসাররা হঠাৎ লাঠি চালাইয়া কয়েকজন চাষীকে আহত করিল। গ্রামবাসীরা ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া আনসারদের হাত হইতে লাঠি ছিনাইয়া লইল।

মুহূর্ত মধ্যে পুলিশ গুলি চালাইতেই কৃষকরা মাটিতে শুইয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিল, ধানের গাড়ি আগাইয়া চলিতেই চাষীরা আবার উঠিয়া গাড়ির গতিরোধ করিল ;—আওয়াজ তুলিল, "জান দিব তবু ধান দিব না," পুলিশ গুলি করিয়া দুই চাষীকে মাটিতে ফেলিয়া দিল। ইহার পরও মৃত্যুভয়হীন টঙ্ক চাষীরা ধানের গাড়ি আটকাইয়া রাখিল। দারোগা হুকুম দিলেন, "আজ সন্ধ্যা হইয়া গেল, আমরা চলিয়া যাই।" গাড়োয়ান ধানের গাড়ি মাঠেই ফেলিযা রাখিয়া গরু লইয়া চলিয়া গেল। রাত্রির অন্ধকারে পুলিশ আনসার দলও মিলাইয়া গেল। সংগ্রামী জনতা থমকিয়া দেখিল তাহারা সবাই অনেক দূরে—গ্রামের বাহিরে প্রান্তরে আসিয়া পড়িয়াছে, গুলিবিদ্ধ দুই-জন চাষী কাতর আর্তনাদ করিতেছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত চাষীরা তখন আহত সাথী দুই জনকে পিঠে বহন করিয়া গ্রামের দিকে ফিরিল।

১৯৪৯ সালে এই প্রথম আবার আগ্নেয়াস্ত্রের বিকট গর্জন পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হইল। বটতলার এই গুলিবর্ষণের সংবাদ সর্বত্র দাবাগ্নির মতো ছড়াইয়া পড়িল। টঙ্ক চাষীর পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও ব্যথা বেদনার স্রোত উত্তাল হইয়া উঠিল। পরদিন লেঙ্গুরার কৃষক সমিতি পক্ষ হইতে চল্লিশ জন জঙ্গী কৃষকের একটি দল সমস্ত রকম হাতিয়ার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধপত্র সহ বটতলা আসিয়া পৌঁছিল। প্রথমেই তাহারা সেই প্রান্তরে পড়িয়া থাকা ধানের গাড়ি দুইটি দখল করিল এবং আহত কৃষক দুইজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাইয়া দিল। ছোট্ট একটি জনসভায় উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়া তাহারা শত্রুর প্রতি জেহাদ ঘোষণা করিল।

এই ঘটনার পরেই ২৩শে জানুয়ারী লেঙ্গুরা মৌজার কৃষকরা নূতন করিয়া বসানো সুসং জমিদারদের কোর্ট অব ওয়ার্ডের চৈতন্যগড়ের কাছারীবাড়ি দখল করিল। পরদিন ভোর ৭ টায় কাছারী প্রাঙ্গনে কৃষকদের এক সমাবেশ হইল এবং গণ-আদালতের সামনে এক জন তহশীলদার ও পাঁচ জন বন্দী পেয়াদা ও পিয়নের বিচার হইল। কাছারীর আসবাবপত্র সব কিছু আটক করা হইল, কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ সব আগুনে পোড়ানো হইল। জনতার এই গণ-আদালত ঘোষণা করিল যে এই মৌজায় জমিদারের সব রকম বাকি বকেয়া টংক ধান ও খাজনা রহিত করা হইল, কোন কৃষকই যেন আর টঙ্ক ধান না দেয়। পরে কোর্ট সব ওয়ার্ডের ম্যানেজার ও পুলিসবাহিনী হাতী জিপ লইয়া বার বার হামলা করিয়াও জনতার বূহ ভেদ করিতে পারিল না। কাছারী বিদ্রোহীদের দখলেই রহিয়া গেল। এই ভাবে কলমাকান্দা থানার ছয়নং লেঙ্গুরা ইউনিয়ন সর্বপ্রথম বিদ্রোহী চাষীদের দখলে চলিয়া গেল। শুধু জমিদারদের কাছারীবাড়ি দখল করিয়া ও খাজনা টঙ্ক ধান বন্ধের ঘোষণা করিয়াই কাজ শেষ করা হইল না। দুই দিন বাদেই কালিকাপুরের দু গাড়ি ধান আটক করা হইল। হাজং রমণী মানিক, কলাবতী কুড়ি জন মেয়ে লইয়া ধানের গাড়ির সম্মুখে যাইয়া বাধা দিতেই বিহারী গাড়োয়ান দ্বিরুক্তি না করিরা মেয়েদের নির্দেশিত স্থানে ধান তুলিয়া দিয়া গেল। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা গেল কৃষকদের ন্যায্য দাবির এই আন্দোলন গরিব জনতার মধ্যে কত ব্যাপক ও গভীর সমর্থন লাভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে লেঙ্গুরা এলাকার সংগ্রামের কথা পশ্চিম এলাকাগুলিতে পৌঁছিল। সুসং দুর্গাপুর থানার মাইজপাড়া ইউনিয়নে আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করিল। সরকারী কর্মচারীরা চারুয়া পাড়ার বিশ্বেশ্বর সরকারের ১০০ শত মন লেভী ধান জোর করিয়া লইয়া চলিল। বিশ্বেশ্বরের দুই স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের আপত্তি ও আবেদন সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। এমন সময় সংবাদ পাইয়া পরেশ সরকারের নেতৃত্বে জঙ্গী দল আসিয়া ধানের গাড়িগুলি অবরোধ করিল।

অবস্থার গতি মন্দের দিকে যাইতেছে লক্ষ্য করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিলেন, "আমার এই লেভী ধান দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হোক, আমি সরকারের নিকট মূল্য বাবদ কিছুই চাহি না।" সরকারী কর্মচারীরা বিশ্বেশ্বরের এই উদার আবেদনও গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু জঙ্গী দল হিন্দু মুসলমান জনতার মধ্যে জোর করিয়া উক্ত ধান বিতরণ করিয়া দিল। ফলে জনসাধারণের মনে বিপুল উৎসাহ ও প্রেরণা দেখা দিল। জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে প্রতি-দিনই গোড়াশাও, গৌরীপুর, কালিকাপুর, গোপালপুর, ছনগড়া, ভেদীকুড়া বগাঝোরা, জাঙ্গালীয়া, কমলপুর, বাগপাড়া, কাশীপুর, কালিকাবাড়ী, প্রভৃতি গ্রামে মহাজনদের ধান, টঙ্ক ধান, সরকারী লেভী ধান আটক পড়িতে লাগিল। সুসং পরগণার ফসল রক্ষার গণ-আন্দোলনের ঢেউ সেরপুর পরগণার শোষিত চাষীদের মনেও আঘাত দিতে লাগিল। "জান দিব তবু ধান দিব না, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাই" প্রভৃতি আওয়াজ সমস্ত শ্রেণীর কৃষকদের মধ্যে এক বিপ্লবী অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিল। স্বতস্ফূর্তভাবে সমস্ত রকম ধান আদায় বন্ধ হইয়া গেল। সরকারী কর্মচারীরা ধান আদায়ের নৈতিক বল হারাইয়া ফেলিল। ধান আদায়ের জন্য গ্রামে প্রবেশের নামেই ত্রাসের সঞ্চার হইল।

২৮শে জানুয়ারি লেঙ্গুরা পুলিশ ক্যাম্পের সম্মুখের ময়দানে ৫ হাজার কৃষক জনতার এক বিরাট জনসভা হইল। বেলা ২টা হইতে এলাকার দূর দূর গ্রাম হইতে চাষীরা দলে দলে আসিয়া সভায় যোগ দিল। এই জনসভায় কৃষক-নেতারা শেষ বারের মতো বক্তৃতা দিয়া আকুলভাবে আবেদন জানাইলেন যে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ ও টঙ্ক প্রথা রদের ঘোষণা করা হোক, সরকারের রাজস্ব ও ট্যাক্স আদায় এবং খাদ্য সংগ্রহের কাজে স্থানীয় কমিটিগুলির সহযোগিতা লওয়া হোক এবং এই আংশিক শাসন সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা আদিবাসীদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করা হোক। এই সভার গৃহীত প্রস্তাবাদিও লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে জানানো

হইল। সুসং অঞ্চলের এই জনসভা হইতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে জমিদারী প্রথা ও টঙ্ক প্রথা উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত কৃষকদের গণ-আন্দোলন কিছুতেই থামিবে না। এই অঞ্চলের জাগ্রত কৃষকরা ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন না হইলে নেতাদের কাছে শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা আসিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা সংগ্রামের যবনিকা এখনই টানিতে বাজী নয়। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের এই আন্দোলনেব সমর্থনে সারা জেলার হিন্দু-মুসলমান চাষীরা যশোদলে এক সম্মেলন করিলেন এবং রাষ্ট্র নেতাদেব জনস্বার্থ-বিরোধী নীতির পবিবর্তন দাবি করিলেন। শুধু তাহাই নয়, করিমগঞ্জ, তারাইল, যশোদল, নিযামতপুর, ঝাউগড়া, বালী, বাংলা প্রভৃতি স্থানেব কৃষকরা সংগ্রাম ঘোষণাবও প্রস্তাব লইলেন।

১৯৪৯ সনের ৩০শে জানুয়ারী। আবার সেই স্মরণীয় শহীদ দিবস ফিরিয়া আসিল। ৩ বৎসর আগে এই দিনে বীর মাতা রাসমণী ও তাঁহাব সাথী সুরেন্দ্র সশস্ত্র ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া শহীদ হইয়াছিলেন। জীবনের মূল্যে তাঁহারা প্রমাণ করিয়া গিযাছেন যে ঐক্যবদ্ধ জনতার শক্তি দুর্বার ও অপরাজেয়। প্রমাণ কবিয়াছেন, শত্রুর প্রতি সুতীব্র ঘৃণা ও গভীর শ্রেণীচেতনা লইয়া সংগ্রাম করিলে নিবস্ত্র জনতাও শত্রুর আগ্নেয়াস্ত্রকে পবাভূত করিতে পারে। সুরেন্দ্র-রাসমণীর নিকট হইতে এই অঞ্চলের কৃষকরা হাতেনাতে সেই বিপ্লবী শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাই লাভ করিয়াছে। ইতোমধ্যে বটতলা গ্রামে কায়েমী-স্বার্থবাদীরা রাইফেলের গুলিতে টঙ্ক চাষীব তপ্ত রক্ত ঝরাইতে শুরু করিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পরেও আবার শহীদদের রক্ত-রাঙা পথে চাষীদের সংগ্রামে টানিযা নামানো হইযাছে। জানুয়ারি মাসের চতুর্থ সপ্তাহে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রতিটি হাটে বাজারে, গ্রামে গ্রামে বিক্ষুব্ধ চাষীরা প্রচার অভিযান চালাইল। আন্দোলনের ঢেউ সারা অঞ্চল প্লাবিত করিল। কলমাকান্দা, দুর্গাপুব, হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী থানার উত্তরে শত শত গ্রাম দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হইল। ঐ অঞ্চলের কোথাও পুলিশ সিপাহী প্রকাশ্যে জাগ্রত জনশক্তির

সম্মুখে দাঁড়াইতে সাহস করিল না। পাহাড় অঞ্চল আবার জনতার দখলে চলিয়া গেল।

১লা ফেব্রুয়ারি জনতার এক বাহিনী দক্ষিণের কলসিন্দুর পুলিশ ক্যাম্পের পাশ দিয়া নিতাই নদীর পাড়ে প্রচার করিয়া চলিয়াছে। এমন সময় ৩০ জন সিপাহী ৫০ জন আনসার লইয়া দুইদিক হইতে প্রচার-বাহিনীকে নদীর বাঁকে অবরোধ করার জন্য অগ্রসর হইল। সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত কৃষকরা মূহূর্তে, ঝোপে, ঝাড়ে, নদীর বাঁকে, উই ঢিপি ও আলের আড়ালে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের জন্য আশ্রয় লইল। আর কয়েক কদম আসিলেই শত্রুর নিস্তার নাই, একসাথে সবাই ঝাঁপাইয়া পড়িবে। কিন্তু সশস্ত্র সিপাহীর দল আর অগ্রসর হইতে সাহস পাইল না। দূর হইতে গুলি ছুঁড়িতে লাগিল। জাঙ্গালীয়াপাড়ার বৃদ্ধ রামদয়াল ও রামচরণ কলসিন্দুর হাট হইতে ফেরার পথে সিপাহীদের এই এলোপাথারি গুলিতে মৃত্যুবরণ করিল। এই হত্যাকাণ্ড বিদ্রোহী কৃষকের ক্রোধাগ্নিতে ইন্ধন জোগাইল।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিখ্যাত লেঙ্গুরা হাট। এই হাটের পাশেই পরিখা ব্যারিকেড প্রস্তুত করিয়া প্রায় সব রকম আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত ৩০ জন সিপাহীর একটি ক্যাম্প রহিয়াছে। সপ্তাহকাল আগেই এই ক্যাম্পের সম্মুখস্থ মাঠে ৫ হাজার কৃষকজনতার এক জনসভা হইয়াছে। সিপাহীরা সব কিছু শুনিয়াছে ও দেখিয়াছে। কিন্তু আজ সূর্যোদয়ের আগেই দুই জন কুখ্যাত দালাল সুবেদারকে মিথ্যা সংবাদ পৌঁছাইল যে গত রাত্রে এই এলাকার বিদ্রোহী টঙ্ক চাষীরা সিদ্ধান্ত করিয়াছে আজ হাট বসিলে যে কোন সুবিধামতো সময়ে তাহারা এই ক্যাম্প আক্রমণ করিবে ও সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র লুট করিবে। এই মিথ্যা সংবাদ পাইয়া সিপাহীরা আতঙ্কগ্রস্ত হইল। কেহ কেহ ক্যাম্প ছাড়িয়া সুসং চলিয়া যাইতে পরামর্শ দিল। কিন্তু পাঞ্জাবী সুবেদার ভীরুর মতো পলাইয়া যাইতে চাহিল না। সে পনের জন

পাঞ্জাবী·সিপাহীর উপর নির্ভর করিল এবং সব কয়টি আগ্নেয়াস্ত্রে গুলি ভরিয়া উন্মত্তের মতো টহল দিতে লাগিল। বেলা ১১টায় প্রতিদিনকার মতো হাট জমিয়া উঠিল। এমন সময় উত্তরের পথ ধরিয়া পঁচিশ জন জঙ্গী টঙ্ক চাষীর একটি প্রচারবাহিনী হাটের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের পিঠে বর্শা, কোমরে ভোজালী হাতে লালঝাণ্ডা, পোস্টার, ড্রাম ও বিউগল। প্রচারবাহিনী হাটের উত্তর সীমানায় আসিয়া আওয়াজ তুলিল—জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কর, ধান সিজ বন্ধ কর, জান দিব তবু ধান দিব না, ইনৃকিলাব জিন্দাবাদ ইত্যাদি। হাটের জনসাধারণ আনন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া একসাঁথে গগন বিদীর্ণ করিয়া মুহু'মুহু' সেই আওয়াজে কণ্ঠ মিলাইল। প্রচারবাহিনী আরও অগ্রসর হইল। হাটের প্রান্তে দাঁড়াইয়া নায়ক মঙ্গলচান বলিলেন; ভাইসব! স্বাধীনতা লাভের পরেও আমরা অতীতের দুই শত বৎসরের মতোই পরাধীনতার জ্বালা যন্ত্রণা, অত্যাচার অবিচার ভোগ করিতেছি, আজও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হইল না। শুধু তাহাই নয় সাত বৎসর আগে আমরা যে জমিদারী জুলুম গ্রাম হইতে দূর করিয়াছিলাম আজ তাহাই আবার দেখা দিয়াছে। আবার নূতন করিয়া পুলিশ ক্যাম্প বসানো হইয়াছে। জুলুম করিয়া লেভী ধান আদায় করা হইতেছে। তাই আসুন আমরা আওয়াজ তুলি— জমিদারী প্রথার অবসান হউক, গরিব চাষীর ধানে লেভী নাই, এলাকার উদ্বৃত্ত খাদ্য নগদ মূল্যে ক্রয় কর ইত্যাদি।" বক্তৃতা শেষ করিয়া মঙ্গলচান তাহার বাহিনী লইয়া হাটের অপর দিকে রওনা হইতেই ক্যাম্পের সিপাহীরা প্রাণের ভয়ে শিহরিরা উঠিল। সুবেদারের আদেশে তাহারা পরিখার মধ্যে আশ্রয় লইল। রাইফেল লইয়া সুবেদার নিজে বালুর বস্তার পিছনে আড়াল লইল,—সিপাহীদের আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নি উদ্গীরণের জন্য একদম প্রস্তুত হইল। ক্যাম্পের অনুমান ২০।২২ গজ পাশ দিয়া প্রচারবাহিনী অগ্রসর হইতেই সহসা সিপাহীদের রাইফেল গর্জিয়া উঠিল, এক ঝাঁক গুলি বর্ষিত হইল। চোখের নিমেষে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ চাষীরা মাটিতে শুইয়া পড়িল। কিন্তু

আত্মরক্ষার কোন ভাল আড়াল সেখানে ছিল না, মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো বিপদজ্জনক, ফিরিবার কোন পথ নাই। এদিকে হাটের জনতা প্রথমে হতচকিত, পরে শঙ্কিত হইয়া যে যেদিক পারিল ছুটিতে লাগিল। জীবন-মরণের এই সন্ধিক্ষণে বীর নায়ক মঙ্গলচান সঙ্গীদের আহ্বান করিয়া বলিলেন—"ভাই সব আজ আমাদের বিপ্লবী জীবনের কঠিন পরীক্ষা, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষার একমাত্র উপায় শত্রুকে প্রতিআক্রমণ করা। সুতরাং চল আমরা বুকে হাটিয়া অগ্রসর হই।" সকলের আগে মঙ্গলচান কখনও বুকে হাঁটিয়া, কখনও হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন। এই ভাবে প্রায় ক্যাম্পের দুয়ারে পৌঁছিতেই এক ঝাঁক গুলি তাঁহার চোখ, মুখ, বক্ষ বিদীর্ণ করিল। শুধু একবার মাত্র শোনা গেল—"অগ্রসর হও"। তৎ-ক্ষণাৎ বীর অগেন্দ্র চিৎকার করিয়া বলিল—"মঙ্গলদার রক্তের প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর হও।" বুকে হাঁটিয়াই জঙ্গীরা শত্রুর অনেক কাছে পৌঁছিয়াছে। হাটের হতাহত জনতা চিৎকার করিতেছে। উর্ধ্বে রাইফেলের মুহুর্মুহু গর্জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই অগেন্দ্রও গুলিবিদ্ধ হইয়া ধূলায় লুটাইয়া পড়িল এবং আর্তকণ্ঠে বলিল—"আমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিও—লালঝাণ্ডা তুলিয়া ধর।" জঙ্গীরা দীর্ঘদিনের বহু আন্দোলনের সাথী মঙ্গলচান ও অগেন্দ্রের রক্তাপ্লুত দেহের দিকে ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু মাটি হইতে মাথা তুলিতে পারে না,—তুলিলেই শত্রুর গুলিবিদ্ধ হইতে হয়। জীবনের ইহা এক কঠিন মুহূর্ত। পর পর দুইজন প্রথম শ্রেণীর বিদ্রোহী নায়ক মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে শত্রুর গুলিতে নিহত হইল। এই অঞ্চলের সর্ববৃহৎ এক হাটের সমগ্র জনসাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কৃষকদের স্বার্থে সংগ্রাম করিয়া তাহারা শেষ বিদায় লইল। বিদ্রোহী কৃষকদের রক্ত আর জনসাধারণের রক্ত একসাথে প্রবাহিত হইল এবং পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে এক বিরাট গণ-বিদ্রোহের সৃষ্টি করিল।

লেঙ্গুরা হাটে গুলি চলিতেছে, মঙ্গলচান, অগেন্দ্র মারা গিয়াছে—বহু

লোক হতাহত হইয়াছে, এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। এই ধরনের নানা সংবাদ জনতার মুখে মুখে বিদ্যুৎবেগে চারদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং চারদিক হইতে হইতে উত্তেজিত হিন্দু-মুসলমান মেয়ে-পুরুষ, কিশোর বৃদ্ধ কৃষকেরা লাঠি, জাঠি, বর্শা, ফালা, রামদা যে যাহা পাইল তাহা লইয়াই উন্মত্তের মতো স্বতস্ফূর্ত ভাবে লেঙ্গুরা হাটের দিকে ছুটিয়া চলিল। তাহাদের মুখে শুধু এক কথা "হত্যার প্রতিশোধ চাই"। বেলা ৩টার মধ্যে লেঙ্গুরার পুলিস ক্যাম্প চাবিদিক হইতে বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহী জনসাধারণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইল। মৃত্যু ভয়ে ভীত সিপাহীরা ক্যাম্প হইতে পলায়নের জন্য দুই তিন বার পথ খুঁজিল। কিন্তু কোথায় পথ? চতুর্দিকে গ্রামের সম্মুখে মাঠে সশস্ত্র জনতা পলায়নের সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়াছে। ইতিমধ্যে ৩০।৪০ জনের একদল জঙ্গী আত্মরক্ষার কোন কৌশল অবলম্বন না করিয়াই বিদ্যুৎবেগে ক্যাম্পের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সিপাহীরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অবিরাম গুলি বর্ষণ করিয়া চলিল। একদিকে সাধারণ কৃষকের হাতিয়ার, আর অন্যদিকে ত্রিশটি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। অভূতপূর্ব, অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া কৃষকেরা একে একে মৃত্যুবরণ করিল। তবুও কেহ পশ্চাদপসরণ জানে না। হাজং বধূ শঙ্খমণী আহত হইল, পাশেই তাহার স্বামী তাহাকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াইতেই বীর কন্যা বলিয়া উঠিল,—"মকে না চা, শত্রুকে মার, ওলা রক্ত লা'।" (১) একটু দূরেই কুমারী কন্যা রেবতী লুটাইয়া পড়িল গণেশ্বরীর শুষ্ক বালুচরে। শঙ্খমণী রেবতী, সারথী, যোগেন, বদক, স্বরাজ, একে একে এমনই ১৫ জন বিপ্লবী চাষী প্রায় ৩ ঘণ্টা সংগ্রাম করিয়া শহীদের মৃত্যুবরণ করিল। কিন্তু সিপাহীরা তখনও চতুর্দিক হইতে অবরুদ্ধ। সূর্য অস্ত গেল, ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার রণাঙ্গণ ঢাকিয়া ফেলিয়া সংগ্রাম থামিল। পাহাড়িয়া নদী গণেশ্বরীর ক্ষীণ স্রোত বিদ্রোহীদের রক্তধারা দক্ষিণে

(১) "আমারদিকে তাকাইও না—শত্রুকে মার—তাহার রক্ত লও।"

প্রবাহিত করিয়া লইয়া চলিল। আর তাহারই ধূসর বুকে রচিত হইল পনেরটি বীর কৃষক সন্তানের বালুকাময় সমাধি।

রাত্রির ঘন অন্ধকার নামিয়া আসিতেই মাত্র বারো জন দুর্ধর্ষ গেরিলা দুইদলে ভাগ হইয়া সিপাহীদের পলায়নের পথে ওত পাতিয়া রহিল। সিপাহীরা নিজ নিজ অস্ত্র পিঠে ফেলিয়া রাত্রির অন্ধকারে সুসং দুর্গাপুরের পথে রওনা হইল। জিলাতলার মাঠ পার হইয়া কালিকাপুব মাঠে পৌঁছিতেই গেরিলাদের হাতবোমা নিক্ষিপ্ত হইল। বিস্ফোরণে দুই জন সিপাহী আহত হইল। একজন দশ বারো গজ অগ্রসর হইতেই বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হইল। মুহূর্ত মধ্যে আব একটি হাত বোমা নিক্ষেপ করিয়া আরও চার জন সিপাহীকে জখম করা হইল। সিপাহীরা অন্ধকারে দক্ষিণদিকে ছুটিযা পালাইল। পনেরটি কৃষকের প্রাণের বিনিময়ে মাত্র একটি সিপাহীকে হত্যা করা সম্ভব হইল ; জখম হইল বেশ কয়েকজন। পরদিন সারা সুসং পরগণায় শতাধিক সিপাহীর সমাবেশ করা হইল।

লেঙ্গুরা হাটের এই সশস্ত্র সংগ্রামের সংবাদ নানাবাভে পল্লবিত হইয় সমগ্র পাহাড় অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল। বিদ্রোহী কৃষকরা এইবার রাসমণী-সুরেন্দ্র ও নয়ানের সংগ্রামের সময় সংগৃহীত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হইল। বটতলা জাঙ্গালিয়া পাড়া ও লেঙ্গুরার সংগ্রামের অভিজ্ঞতা হইতে তাহারা বুঝিল—জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ শুধু কৃষকের রক্ত দানেই সফল হইবে না। শাসক শ্রেণীর রক্তেরও প্রয়োজন রহিয়াছে, ইংরাজ চলিয়া গেলেও তাহার প্রেতাত্মা এই রক্ত চাহিতেছে।

সুসং পরগণার সশস্ত্র সংগ্রামের কথা শেরপুর পরগণার কৃষকদের উত্তেজিত ও চঞ্চল করিয়া তুলিল। শেরপুরের জনৈক তালুকদার এই সময় প্রচুর অর্থব্যয়ে পাঁচ জন সশস্ত্র সিপাহী ও পঁচিশ জন আনসারকে তাহার মধ্যমকুড়া কাছারি বাড়িতে বসাইয়া টঙ্ক ধান ও খাজনা আদায় করিতেছে। দুই দিন আগেই আলী হুসেন ও হুসেন আলীর সমস্ত ধান জোর করিয়া আদায়



জনৈকা মহিলা কর্মী



বোমং নারী

করিয়াছে, গ্রামের হিন্দু-মুসলমান কৃষকগণ ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করিলেও আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া প্রতিরোধ কবিতে পারে নাই। কিন্তু গত সাত দিনের মধ্যেই কৃষকদের ধান রক্ষার আন্দোলন একাধিক জায়গায় সশস্ত্র সংগ্রামের উচ্চতর পর্যাযে পৌঁছিযা যাওয়ায এই অঞ্চলেও তাহার প্রভাব পড়িল। ৯ই ফেব্রুয়ারি একদল জঙ্গী কাকড়কান্দি, বিন্নিবাড়ী, কাউলারা প্রভৃতি গ্রামে প্রচার করিয়া শালমারা পৌঁছিতেই হঠাৎ সিপাহীদের মুখো-মুখি আসিয়া পড়িল। বিনা প্ররোচনায় অকস্মাৎ সিপাহীরা গুলি ছুঁড়িতেই জঙ্গী কৃষকরা গেরিলা কায়দায় বিবাট বিরাট শাল গাছেব আড়াল হইতে তীর বর্শা ও ফালা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উভয পক্ষেই কঠিন সংগ্রাম চলিতেছে এমন সময় তিন মাইল দূরবর্তী নালিতাবাড়ী হইতে পনের জন সিপাহী ও বহু আনসার প্রচুর পরিমাণে কার্তুজ সহ আসিয়া সিপাহীদের শক্তি বৃদ্ধি করিল। জঙ্গীদল চাবিদিক হইতে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িতে পারে এই আশঙ্কায় পিছনে হটিয় গেল। এই সংগ্রামের নায়ক সতীন্দ্র ডালু শহীদের মৃত্যু ববণ কবিল এবং শচীন্দ্র ঘোষ গুলিতে অন্ধ হইয়া বন্দী হইল।

এই কয়টি সশস্ত্র সংগ্রামের পব সুসং হালুয়াঘাট নালিতাবাডী থানার পঁচিশটি পুলিশ ক্যাম্পে সশস্ত্র সিপাহী সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল এবং অসংখ্য আনসার সমাবেশ করা হইল। সাবা অঞ্চল জুড়িযা অত্যাচারের তাণ্ডব শুরু হইল। ৫ই ফেব্রুযারী রাত্রি ১ টায় জনৈক উচ্চ পুলিশ-কর্মচারী প্রচুর সিপাহী ও আনসার লইয়া নালিতাবাড়ী এলাকার বিপ্লবীদের গোপন কেন্দ্র হলদিগ্রাম চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা সকালের আলোতে আক্রমণ করার জন্য প্রতীক্ষায় রহিলেন। বিপ্লবীদের গোপন সংবাদবাহী এই সংবাদ রাত্রেই কেন্দ্রে পৌঁছাইল। সেখানে যে নেতারা ছিলেন তাঁহারা তৎক্ষণাৎ স্থির করিলেন যে এই রাত্রির অন্ধকারেই সমস্ত গোপন মালপত্র লইয়া সিপাহী বেষ্টনীর বাহিরে চলিয়া যাইতে হইবে;

অন্যথায় দিনের আলোতে আক্রমণ করিলে সীমাহীন ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা। সুতরাং সেইভাবে দুর্গম পাহাড়িয়া পথে চলিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ জঙ্গীদের পুরোভাগে রাখিয়া নেতারা দুই দলে শত্রু-বেষ্টনীর অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্থান লক্ষ্য করিরা অগ্রসর হইলেন। মেয়ে কর্মীরাও পুরুষ জঙ্গীর ছদ্মবেশে শত্রুর বৃহি-ভেদ করার জন্য উভয় দলেই রহিল। স্থানীয় জনৈক চৌকিদার বিদ্রোহীদের গতি অনুমান করিয়া বলিতেই সিপাহীরা টর্চের আলো ফেলিয়া গুলি ছুঁড়িল। জঙ্গীরাও পাল্টা জবাব দিল। পাহাড়ী পথঘাট সম্বর্কে অভিজ্ঞ বিদ্রোহী চাষীরা পাহাড়ের আড়ালে ও ঝরনাব জলে গা ঢাকিয়া নিরাপদ স্থানে চলিযা গেল। কিন্তু অপব এক দল সিপাহীদের ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না। ভীষণভাবে আহত হইয়া দুইজন নায়ক ভোরের দিকে বন্দী হইলেন। উভয় পক্ষেই বহু আহত হইল। পরদিন সকালে পুলিশ আগুন জ্বালাইয়া গ্রামটি পুড়াইয়া দিয়া দ্রুত সরিয়া পড়িল। এই অঞ্চলের প্রধান নায়কদের এইভাবে গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া জনসাধারণের বিক্ষোভ চরমে উঠিল। বেলা ৮ টায় এক বিরাট জনতা নন্নী, বারোয়ামারী, নালিতাবাড়ী সিপাহী ক্যাম্পের দিকে স্বতস্ফূর্ত-ভাবে অভিযান করিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করিয়া উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিল। ক্রোধে উন্মত্ত কৃষক জনতা তখন পথের সেতু ভাঙিয়া ফেলিল, কারণ এই পথেই শত্রুর জীপ, ট্রাক সহজে আসিয়া গ্রাম তছনছ করিয়াছে। এক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানী রাইফেল বাহিনী ও আনসার বাহিনী এই এলাকায় বীভৎস অত্যাচার শুরু করিল। শতাধিক চাষীকে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করিয়া পঁচিশ জনকে জেলে পাঠানো হইল। নালিতাবাড়ীর হলদি-গ্রাম এই অঞ্চলের "হলদিঘাট" নামে পরিচিত হইল।

লেঙ্গুরাহাটে সশস্ত্র সংগ্রামের পর হইতেই সারা পাহাড় সীমান্তে একটা বর্বর অত্যাচারের প্রবল বন্যা বহিয়া চলে। আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত পাঞ্জাবী ও পাঠানী ফৌজ সশস্ত্র পুলিস ও আনসার মোট ১০০০ হাজার

সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা এই অঞ্চল ঘিরিয়া রাখা হয়। এই ফৌজের দল অবিরত গুলি করিয়া মানুষ হত্যা করিয়াছে, শত শত কৃষকের বাড়িঘর লুট করিয়া ধ্বংস করিয়াছে। ইহারা মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। ক্যাম্পগুলি হইয়াছে হিংস্র পশুর আস্তানা। সেখানে প্রতিদিন বহু হাজং, গারো ও মুসলমান চাষীকে ধরিয়া নিয়া বিদ্রোহীদের খোঁজ দেওয়ার জন্য অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছে।

স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য চাষীদের নখের নীচে সূচ ফুটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। টঙ্ক চাষীদের ধান চাউল, গরু, মহিষ প্রভৃতি লুটতরাজ করিয়া লওয়া, ঘরদুয়ার ভাঙিয়া ফেলা, কোথাও আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। পিটুনী ট্যাক্স বা পাইকারী জরিমানা আদায়ের অত্যাচার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। এক একটি ইউনিয়নে ৫।৭ হাজার টাকা ট্যাক্স আদায়ের জন্য ৫০।৬০ হাজার টাকার সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়াছে। হালুয়াঘাট থানার একমাত্র ভুবনকুড়া ইউনিয়ন হইতেই ৫।৭ লক্ষ টাকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আটক করা হইয়াছে।

মার্চ মাসের এক ভোরে লক্ষীকুড়া তে-রাস্তার মোড়ে তিনখানা ট্রাক ও জীপ গাড়ি হইতে সিপাহীরা দ্রুত নামিয়া পড়িল। পিছনে সুরক্ষিত জীপ হইতে নামিলেন পুলিস সাহেব নিজে। গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়াই স্থানীয় চৌকিদার দফাদারের সাহায্যে সিপাহীরা চন্দ্র সরকারের বাড়ি চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। পুলিস সাহেব গর্জন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চন্দ্র কোথায়?" কেহ কোন উত্তর না করিতেই সিপাহীরা বাড়ির ছনের ঘর, মাটির দেওয়াল হাতীর সাহায্যে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল। ঘরের বাসন-কোসন শিশি বোতল, বিছানা বালিশ সব ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া চুরমার করিয়া উঠানে ছড়াইয়া ফেলিল। গ্রামের মেয়েদের চুলের মুঠি ধরিয়া ধানের ক্ষেতের মধ্য দিয়া হেচরাইয়া নিয়া চলিল। কোলের শিশুরা লাঞ্ছিতা মায়েদের করুণ অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া মায়েদের নিকট যাইতে

চেষ্টা করিতেই সিপাহীরা বুটের লাথি মারিয়া কচি শিশুদের দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। তবুও কৃষক মেয়েরা "চন্দ্র কোথায়" বলিল না।

দল, মত, স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত কৃষকদের উপর এইভাবে অত্যাচার করার ফলে সংগঠিত বিদ্রোহী চাষীগণ তখন সাধারণ গ্রামবাসীদের নিকট হইতে খানিকটা দূরে থাকিয়া প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালনা করার কৌশল গ্রহণ করিল। এই অঞ্চলের দুর্ভেদ্য পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সশস্ত্র প্রতিরোধের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানে পরিখা খনন করিয়া ও শালের খুঁটির বেষ্টনী রচনা করিয়া অম্বুলোকা, দাম্বুক, বেড়াখালি, মেলেং, পানিহাটা, রাংটিয়া, চান্দুভুই, হালচাটি প্রভৃতি নামক স্থানে নয়টি গেরিলা ক্যাম্প স্থাপন করিল। এই সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের জন্য সুরক্ষিত স্থানে তিনটি কারখানা স্থাপিত হইল। এই কারখানায় গাদা বন্দুক, দেশী পিস্তল, ৬'০" × ৩" মাপের বড় বড় গাদা কামান এবং বিভিন্ন ধরনের হাত বোমা তৈরি করা হইত। এই সব ক্যাম্পে প্রাথমিক চিকিৎসার সাজ সরঞ্জাম, ঔষধ পত্র, এবং অভিজ্ঞ ডাক্তারেরও ব্যবস্থা করা হইল। সারা বৎসরের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখা হইল। এক কথায় এই ক্যাম্পগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বতোভাবে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা হইল এবং সংগ্রামের পদ্ধতিও খাঁটি গেরিলা কৌশল ও নীতি অনুযায়ী চলিল।

বিপ্লবী চাষীদের সুরক্ষিত এই সামরিক ক্যাম্প-জীবন লক্ষ্য করিয়া ছোট ছোট গ্রামের সাধারণ কৃষকগণও নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে একত্রে বাস করিবার জন্য তিন-চারটি জন-ক্যাম্প গঠন করিল। এই সব জায়গায় দিনের বেলায় কৃষকরা নিজ নিজ গ্রামে ক্ষেতে চাষের কাজ করিত। সিপাহীদের আগমন ও আক্রমণ আশঙ্কা করিলেই কাঁশি, ঘণ্টা, শঙ্খ বা সিঙ্গা বাজাইয়া বিপদের সঙ্কেত জানাইত। রাত্রি বেলায় আবার আগুন জ্বালাইয়া বা আকাশপ্রদীপ তুলিয়া গোপন সঙ্কেত জানাইত। এই সঙ্কেত-ধ্বনি বা ইঙ্গিত পাইলেই গ্রামে গ্রামে চাষীরা হুঁশিয়ার হইয়া যাইত। এমনকি গ্রামের মাঠে

মাঠে রাখাল ছেলেরাও যে কোন আক্রমণ আশঙ্কা করিলে, গাছে উঠিয়া কাপড় উড়াইয়া বা বাঁশী বাজাইয়া শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে বিপ্লবীদের সতর্ক করিয়া দিত।

সারা পাহাড় সীমান্তে সংগ্রামের এই কৌশল পরিবর্তনে সাধারণ গ্রামবাসীরা কিছুটা অসহায় বোধ করিলেও বিপ্লবী নায়ক ও জঙ্গীদের শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করার দায়িত্ব হইতে অনেকটা মুক্ত রহিল। গ্রামগুলিও সিপাহী ও বিদ্রোহীদের প্রত্যক্ষ হাত হইতে অনেকটা নিরাপদ রহিল। ১৯৪৯ সনের মে হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গেরিলাদের কাজ হইল ভীষণ অত্যাচারী পুলিশ ক্যাম্প ও দালালদের ঘাঁটিগুলি বাছিয়া বাছিয়া অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া পর্যুদস্ত করা। প্রথমেই তাহারা সানখোলা, খাড়নৈ ও হাতিপাগারের ক্যাম্প তিনটি বোমা, রাইফেল, স্টেনগান ও প্রচুর গাদা বন্দুকের সাহায্যে রাত্রির অন্ধকারে আক্রমণ করিয়া হঠাইয়া দিল। সিপাহীরা ক্যাম্পের চতুর্দিকে পেট্রোমাক্স লাইটের ব্যবস্থা করিল এবং সেন্ট্রি বক্স স্থাপন করিয়া পাহারার ব্যবস্থা করিল।

আমিরখাঁকুড়া হইতে ধান লইয়া যাওয়ার সময় দুই জন অত্যাচারী আনসার নিহত হইল এবং তাহাদের লাস বস্তা বন্দী করিয়া সেই গাড়িতেই ফেরৎ পাঠানো হইল। খাড়নৈ, ঝলঝলিয়া, জামগড়া, সন্ধ্যাকুড়া, কাংসা প্রভৃতি পঁচিশটি মহাজনের খামারের ধান দখল করিয়া দুঃস্থ গারো ও মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করা হইল। বাগপাড়া খামারটি সম্পূর্ণভাবে আগুনে পোড়াইয়া দিল। মে মাসে হাল চাষ করার সময় ঘিলাগড়ার মাঠে সংগ্রাম করিয়া ভীম, বদক ও রহিম সিপাহীদের হাতে মৃত্যু বরণ করিল। দুই জন সিপাহীও আহত হইল। কালিকাপুর, মাইজপাড়া, ঘিলাবই, রামচন্দ্রকুড়া, মায়াখালি, বিক্রিকুড়া, ধানশাইল প্রভৃতি গ্রামের পঁয়ত্রিশ জন দালালকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল এবং তাহাদের অস্থাবির সম্পত্তি জনসাধারণের মধ্যে বিলি করিয়া দেওয়া হইল ও বন্দুকগুলি গেরিলা দখল করিল। এই কয়মাস প্রত্যহ এই বিস্তৃত

এলাকার কোথায়ও না কোথায়ও সশস্ত্র সিপাহীদের সঙ্গে সাধারণ কৃষক অথবা জঙ্গী গেরিলাদের সংঘর্ষ চলিতে লাগিল। এমনকি হাটের মধ্যে সিপাহী আনসারদের জোরজুলুমের বিরুদ্ধে জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ চালাইতে লাগিল। কুমারগাতি কৃষক সমিতির সম্মুখের মাঠে ভুবনকুড়া গ্রামে, গোড়াগাওয়ে পরপর কয়েকটি সশস্ত্র সংঘর্ষ হইল এবং উভয় পক্ষেই বহু লোক আহত হইল, অনেক চাষী গ্রেপ্তার হইয়া জেলে গেল। সারা অঞ্চলের সর্বত্র যেন তখন বারুদ ছড়াইয়া রহিয়াছে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বিক্ষিপ্তভাবে জনতার বিক্ষোভ বিদ্রোহে ফাটিয়া পড়িতেছে। ভুবনকুড়া ইউনিয়নের পাইকারী জরিমানার ধান লইয়া যাওয়ার সময় গেরিলা নায়ক সুদর্শন মাত্র সাত জন সাথী লইয়া কড়ইতলা গ্রামের একটি ঝোঁপ হইতে সশস্ত্র সিপাহীদের উপর তিন-চারটি হাত বোমা নিক্ষেপ করিয়া পাঁচ-সাত জনকে আহত করিল। আনসার ও গাড়োয়ানরা দৌড়াইয়া পালাইয়া বাঁচিল। কুড়ি জন সশস্ত্র সিপাহী তখন ঝোপটি লক্ষ্য করিয়া অজস্র গুলি বর্ষণ করিল। ফলে নায়ক সুদর্শন ও হরি সিং ডালু ঐ ঝোপের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করিল। দুইটি বীর কৃষক সন্তান জান দিল—তবুও ধান লইয়া যাইতে দিল না।

সেরপুরের জনৈক জমিদার এই সময় পাইক বরকন্দাজ সহ খাজনা আদায় করিতে গেলে বান্দরকাঁটা অস্থায়ী কাছারী হইতে বিদ্রোহী প্রজারা কৌশলে তাহাকে বন্দী করিয়া বিচারের জন্য গেরিলা ক্যাম্পে পাঠাইয়া দেয়। জমিদারবাবু গণ-আদালতের বিচারকদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি এবং তাহার বংশের কেহ আর কোনও দিন এই জমিদারীর উপসত্ব ভোগ করিতে আসিবেন না। গেরিলা ক্যাম্পের বিচক্ষণ বিচারক বন্দী জমিদার-বাবুকে মুক্ত করিয়া দেন এবং নিরাপদে সংগ্রামী এলাকার বাহিরে পৌঁছাইয়া দেন। যে সব জমিদার মহাজন এই অঞ্চলের সংগ্রামী কৃষকদের দাবি মানিয়া লইয়াছে তাহারা সকলেই এইভাবে বিদ্রোহী কৃষকদের নিকট হইতে রেহাই পাইয়াছে

ময়মনসিংহ পাহাড়-সীমান্ত অঞ্চলের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী এই সংগঠন ও সংগ্রাম প্রতিবেশী শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জ মহকুমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বিশর-পাশা থানা ও মোহনপুর, বড়ছরা, বংশীকুণ্ডা, লাউড়, বাধানগর প্রভৃতি গ্রামেও 'জান দিব তবু ধান দিব না' আওয়াজ তুলিয়া কৃষকগণ মরণবিজয়ী সংগ্রাম করিতেছিল। এই এলাকার নেতা সুনামগঞ্জের রবি দামের পরিচালনায় একদল জঙ্গী কৃষক জমিদার, জোতদার, মহাজনদের ধান ও সরকারের লেভী ধান না দিয়া তাহা গরিব জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। জুলাই মাসের একরাত্রে মোহনপুর গ্রামে মজুত ধান বিলি করিতে গেলে গোপন সূত্রে সংবাদ পাইয়া কুড়ি জন সশস্ত্র পুলিশ ও ৩০।৩৫ জন আনসার গ্রামটির চতুর্দিক হইতে অবরোধ করে এবং মেগাজিন ভর্তি রাইফেলের বেয়নেট উচাইয়া অকস্মাৎ জঙ্গীদের আক্রমণ করে। দুরন্ত সাহসী ও সুঠামদেহী রবি দাম মুহূর্তে বজ্রমুষ্টিতে জনৈক সিপাহীর রাইফেল চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে চাপিয়া বসে। রাইফেল হইতে গুলি ছুটিলেও তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। বীর যোদ্ধা রবি নিজের পিঠ হইতে বন্দুক খোলার সুযোগ না পাইয়া কোমর হইতে ছোরা বাহির করিয়া শত্রুর কণ্ঠনালীতে আমূল বসাইয়া দেয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একটি সিপাহী রবি দামের পিঠে স্টেনগান বসাইয়া পর পর আট দশবার গুলি ছুঁড়িল। সশস্ত্র সংগ্রামের দক্ষ নায়ক রবি দামের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। শত্রুর সাথে এই মুখোমুখি সংগ্রামে আরও একজন কৃষক গুলিতে মৃত্যুবরণ করিল। চার জন সিপাহীও বর্শার আঘাতে জখম হইল। মোহনপুরের চাষীর আঙ্গিনা সেই দিন বিপ্লবী বীর ও শাসকশ্রেণীর ভাড়াটিয়া সিপাহীর রক্তে প্লাবিত হইল। দুই দিন পর শহীদ রবি দামের অসাড় দেহ নৌকাযোগে সুনামগঞ্জে পৌঁছিলে শহরের জনসাধারণ ভাঙিয়া পড়িল এবং বীরের প্রতি যোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করিল। বাংলার কৃষি বিদ্রোহের ইতিহাসে মধ্যবিত্ত যুবকের আত্মবলিদানের ইহা আর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

এই ভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস সশস্ত্র সংগ্রাম চলিতে লাগিল। প্রত্যহ কোথাও না কোথাও রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটিতে লাগিল। তবুও মরণ-বিজয়ী কৃষকগণ কিছুতেই পিছু হটিল না, পরাজয় স্বীকার করিল না। বিরাম-হীন এই সংগ্রাম ক্রমশঃ দীর্ঘস্থায়ী হইয়া চলিল। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া লীগ সরকার কেন্দ্রের সাহায্য লইয়া আরও অধিক পরিমাণে পাঞ্জাবী, পাঠানী ও বালুচ ফৌজ ও পূর্ব পাক রাইফেল বাহিনীর সিপাহী সমাবেশ করিল এবং সুদীর্ঘ নব্বই মাইল (প্রায় ৭৫০ বর্গ মাইল) এলাকা জুড়িয়া প্রচণ্ড দমননীতি চালাইয়া সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিল। সিপাহীরাও বার বার বিদ্রোহীদের হাতে মার খাইয়া এক একজন আহত পশুর মতো হিংস্র হইয়া উঠিল। কিন্তু কিছুতেই গেরিলাদের গোপন ঘাঁটিগুলি সন্ধান করিয়া আক্রমণ করিতে না পারায় তাহারা গ্রামে গ্রামে নিরস্ত্র কৃষক জনসাধারণের উপর আক্রমণ চালাইয়া পাইকারীহারে নরহত্যা ও লুটতরাজ শুরু করিল।

কলমাকান্দা থানার জাগীরপাড়া গ্রামটি এক গভীর রাত্রে পাঁচশত সিপাহী পুলিশ আনসার হঠাৎ ঘিরিয়া ফেলিয়া আক্রমণ করিল এবং স্ত্রী পুরুষ, শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে চল্লিশ জন ঘুমন্ত চাষীকে নির্বিচারে হত্যা করিল। কৃষকরা প্রতিরোধ বা পলায়নের সুযোগ পর্যন্ত পাইল না। এমন জঘন্য বীভৎস হত্যাকাণ্ড যে কোন দেশের কৃষি-বিদ্রোহের ইতিহাসেই বিরল।

এই ভাবে সর্বত্র হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ দ্বারা কৃষকদের মনোবল ভাঙিয়া দিবায় চেষ্টা করা হইল। এমনকি কৃষকদের এই অঞ্চল হইতে সমূলে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তীব্র দমননীতি চালাইল। ইহার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়িয়াছিল সুসং পশ্চিম এলাকার কৃষকরা ও তাহাদের গেরিলা-বাহিনী। পাহাড় ঝরনার সুরক্ষিত বাঁকে ছিল চেরাখালীর জন-ক্যাম্প, আর তাহারই অদূরে পাহাড়ের অভ্যন্তরে ছিল গেরিলা ঘাঁটি। এই সুন্দর সুরক্ষিত ভৌগলিক পরিবেশে পর পর অনেকগুলি খণ্ড সংগ্রামে সশস্ত্র সিপাহীরা গেরিলাদের হাতে ভীষণভাবে মার খাইয়া পিছু হটিতে বাধ্য হইয়াছে।

তাই চেরাখালী হইতে সাধারণ কৃষকদের না সরানো পর্যন্ত বিদ্রোহীদের কাবু করা যাইবে না শত্রু পক্ষ ইহা বেশ বুঝিয়াছিল। তাই সিপাহীরা প্রায় প্রত্যহ চেরাখালীর জন-ক্যাম্প আক্রমণ করার জন্য মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিতে লাগিল। ফলে সাধারণ গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবন, চাষ-আবাদ, প্রায় অচল হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় ঘটিল গেরিলাদের ধৈর্যচ্যুতি।

একদিন সিপাহীরা নলগড়া, কমলপুর, সোহাগীপুর লুটতরাজ করিয়া মাঠে দাঁড়াইয়া দূরবীণের সাহায্যে চেরাখালীর সব কিছু পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া জঙ্গীরা গ্রামের প্রান্তে খোলা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইতেই সিপাহীরা দূর হইতেই তাহাদের লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। জঙ্গীরাও উত্তেজিত হইয়া পড়িল। গুলির আওয়াজ শুনিয়া কুড়ি জন গেরিলা তাহাদের সুরক্ষিত ঘাঁটি হইতে ছুটিয়া বাহির হইল এবং দুই দলে ভাগ হইয়া জঙ্গী কৃষকদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইল। সিপাহীরা কিছুটা হটিয়া রাণীপুরের খোলা মাঠে চলিয়া গেল। জঙ্গীরাও ধীর স্থির ভাবে চিন্তা না করিয়া হঠাৎ এক ভুল আবেশে সেই খোলা মাঠে নামিয়া পড়িল। গেরিলা দলটিও জঙ্গীদের রক্ষার জন্য নামিয়া গেল। অকস্মাৎ সিপাহীরা তিন চার ঝাঁক গুলি চালাইতেই জঙ্গী ও গেরিলা মাটিতে আড়াল হইল। সিপাহীরা গুলি না করিয়া আগাইয়া আসিতেছে লক্ষ্য করিয়া জঙ্গীরা উঠিয়া দাঁড়াইতেই সিপাহীরা আর এক ঝাঁক গুলি করিল, জঙ্গীরা আড়াল লইল। তারপর বিদ্রোহী কৃষক ও সিপাহীরা রাণীপুরের উন্মুক্ত মাঠে পরস্পরের মুখোমুখি আসিয়া সম্মুখ সমরে দাঁড়াইল। তীর, বর্শা, দা লইয়া জঙ্গীরা মাটি হইতে একটু উঠিতেই সিপাহীরা গুলি নিক্ষেপ করে। আবার সিপাহীরা উঠিতেই গেরিলারা হাত বোমা ও বন্দুক ছুঁড়িতে থাকে। এই ভাবে প্রায় ১ ঘন্টা কাল গুলি বিনিময়ের পর গেরিলাদের টোটা ও হাতবোমার সংখ্যা কমিয়া আসিল। দশ জন গেরিলা (প্রথম দলটি) ও পঁচিশ জন দুর্ধর্ষ জঙ্গী সিপাহীদের রাইফেল ও স্টেনগানের কয়েকশত গুলি কৌশলে ব্যর্থ করিল। উভয়পক্ষে পাঁচ সাত জন

করিয়া আহত হইল। দূর পাল্লার সংগ্রাম ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া গেল লক্ষ্য করিয়া গেরিলা নায়ক যুবরাজ ও ক্ষিরোদ হঠাৎ সিপাহীদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ধারালো অস্ত্রে পর পর চার পাঁচ জন সিপাহীকে গুরুতর ভাবে আহত করিল। রাইফেল বা স্টেনগানের গুলিতে ইঁহাদের দুই জনকে বিদ্ধ করিবার সুযোগ না পাইয়া সুবেদার নিজে রিভলবারের গুলি ছুঁড়িল ও এক সাথে কয়েকটি বেয়নেটের আঘাতে যুবরাজ ও ক্ষীরোদকে নিহত করিল। যুবরাজ ও ক্ষীরোদ অপূর্ব বীরত্বের সহিত লড়াই করিবার সময় অনন্ত ও ও চন্দ্র উভয়ে একজন সিপাহীকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিল। অনন্ত মৃত সিপাহীর রাইফেলটি লইয়া ছুটিতেই পিছন হইতে গুলিবিদ্ধ হইযা পডিযা গেল। রাজেন্দ্র ও অনু আক্রমণ করিল সুবেদারকে। কিন্তু চোখের নিমেষে গুলির আঘাতে রাজেন্দ্র মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। নীরেন্দ্র, বীরজ, রমেশ, অতুল বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করিল, পরে তাহারাও গুলিতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া শহীদের মৃত্যু বরণ করিল। রাণীপুরের শস্যশামল কৃষিভূমি নয়টি বীর কৃষক সন্তানকে কোলে তুলিয়া লইল। সিপাহীরা নিহত হইল ৩ জন। উভয় পক্ষে আহত হইল দশ পনের জন। শহীদ চন্দ্র অনুর ৬৫ বৎসরের বয়স্কা বিধবা মা পাকুড়ী নিজ হাতে দুই ছেলেকে একে একে সমাধিস্থ করিয়া ফুল ছড়াইয়া দিলেন। আর কিনাই তাহার স্বামী নরেন্দ্রের সমাধি লাল শালুতে ঢাকিয়া দিয়া চোখের জলে ধোয়া দুইটি গোলাপ সেখানে রাখিল। রাণীপুরের সংগ্রাম এই অঞ্চলের কৃষি-বিদ্রোহের ইতিহাসে সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ বলিয়া আজও কৃষকরা শ্রদ্ধাসহ স্মরণ করেন।

রাণীপুরের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পরেই বিরাটসংখ্যক পূর্ব পাক রাইফেল বাহিনী দলবল সহ চেরাখালী জনক্যাম্প ও আশে পাশের গ্রামগুলি দখল করিল। সিপাহী পুলিশ ও আনসার মিলিয়া গ্রামবাসীদের উপর অমানুষিক বর্বরোচিত অত্যাচার চালাইল। উন্মত্ত সিপাহীরা কৃষকদের আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে গ্রেপ্তার করিল এবং নির্বিচারে কৃষক রমণীদের উপর পাশবিব

অত্যাচার চালাইল। গ্রামবাসীদের সম্পদ বলিতে যাহা কিছু ছিল সব কিছু তাহারা লুণ্ঠন করিল। এই অঞ্চলের মোট পঞ্চাশ জন চাষীকে দীর্ঘদিন জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তাহাদের মধ্যে সাত জন ময়মনসিংহ জেলখানায় মৃত্যু বরণ করিল।

১৯৪৯ সন, বহু বীর কৃষক সন্তানের আত্মবলিদান ও দীর্ঘদিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইল। ১৯৫০ সনের প্রথম দিকে এই অঞ্চলে সংগ্রাম ও সংগঠনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল ও সংবাদ সহ গোপন সংবাদ-বাহিকা অশ্বমনি, ভদ্রা ও রহেলা সোমেশ্বরী নদী পার হওয়ার সময় গ্রেপ্তার হইল। পুলিশ ইহাদেব ক্যাম্পে আবদ্ধ করিয়া বিদ্রোহীদের সমস্ত গোপন সংবাদ জানাব জন্য অকথ্য নিযাতন করিল এবং শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ দিনেব জন্য ময়মনসিংহ ও রাজসাহী জেলে আটক রাখিল।

ঠিক একই ভাবে কংশনদীর পাড়ে গোপন সংবাদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের রসদ-বাহী রমণী কর এক গভীর রাত্রে টহলদারী সিপাহীদের হাতে হঠাৎ ধরা পড়িল। সিপাহীরা রমণীর দেহ তল্লাসী করিয়া অন্যসব জিনিসের সঙ্গে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পাওয়ায় তাহার গ্রেপ্তারের সংবাদ ক্যাম্পে ডায়েরী না করিয়া অসহায় রমণীকে মাঠের মধ্যেই গুলি করিয়া হত্যা করিল এবং মৃতদেহটি গোয়াতলার হাওড়ে ফেলিয়া রাখিল। এমন বীভৎস ও করুণ ঘটনার মধ্য দিয়া বিদ্রোহ আপন গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিল।

১৯৫০ সনের ৩০শে জানুয়ারিতে আবার ফিরিয়া আসিল শহীদ দিবস। ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে শহীদ হইয়াছেন অনেকে। তাই এইবার শহীদ দিবস প্রতিপালিত হইল সারা অঞ্চলের সমস্ত গেরিলা দল ও আগ্নেয়াস্ত্র সমাবেশ করিয়া চান্দুভূঁই গ্রামের পাহাড় ঘেরা বিরাট উন্মুক্ত মাঠে। প্রতিদলে দশ জন করিয়া মোট ত্রিশটি গেরিলা দল নিজেদের রাইফেল, স্টেনগান, কার্তুজ বন্দুক, গাদা বন্দুক ও হাত বোমা লইয়া সভার চতুর্দিকে সতর্ক পাহারা দিল; আর ১৫০০ হাজার সাধারণ কৃষক নিজ নিজ দেশী অস্ত্র ও নানা ধরনের

হাতিয়ার লইয়া সভায় যোগদান করিল। সিপাহীরা দূর হইতে অসংখ্য ঝাণ্ডা একত্রে উড়িতে দেখিয়া ছুটিয়া আসিতেই গেরিলারা দূর পাল্লার রাইফেল ও বন্দুকের গুলি ছুঁড়িল এবং এক সাথে কয়েকটি বোমার আওয়াজ করিল। সিপাহীরা অমনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল, আর অগ্রসর হইল না। দীর্ঘ দুই ঘণ্টাকাল সভা চলিল, শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া আবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল: জমিদারী ও টঙ্ক প্রথার অবসান না হওয়া পযন্ত কৃষকদের সংগ্রাম চলিতেই থাকিবে। এই সভার শেষে প্রায় সাড়ে তিনশত আগ্নেয়াস্ত্র একসাথে পর পর তিনবার ফায়ার করা হইল এবং বোমা বিস্ফোরণ করা হইল। সমবেত বিদ্রোহী কৃষকরা নূতন প্রেরণা লইয়া নিজেদের বহু দূর দূব ঘাঁটিতে ফিরিয়া গেল। ১৯৫০ সনেব জমিদারী ও টঙ্ক প্রথা উচ্ছেদের প্রস্তাবও কৌশলে বিভিন্ন পোস্ট অফিস হইতে সরকারের নিকট পাঠানো হইল।

১৯৫০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ফরেস্ট বিভাগের এক গোপন সূত্রে সংবাদ পাইযা পূর্ব-পাকিস্তান রাইফেল বাহিনীব দুই শত সিপাহী নালিতাবাড়ীর পশ্চিম এলাকার রাংটীয়া পাহাড ও অরণ্য পূর্ব-পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক হইতে অবরোধ করিল এবং উক্ত পাহাড়ের শিখরে গেরিলাদের একটি ঘাঁটি আক্রমণ করিল। মাত্র দশ জন গেরিলা বহুক্ষণ পর্যন্ত বিরাট সশস্ত্র বাহিনীব সঙ্গে সংগ্রাম করে; পরে গেরিলা নাযক কালিয়া গুলিতে ভয়ানকভাবে আহত হইয়া পশ্চাদপসরণ করে এবং কিশোর যোগেন্দ্র হাজং সংগ্রামে নিহত হয়। তখন পাক বাহিনী গেরিলাদের ঘাঁটি দখল করিয়া প্রচুর ঔষধ পত্র ও খাদ্য সামগ্রী হস্তগত করে।

এই মাসেই সুসং-এর বগাউড়া পাহাড়ের উপর হইতে গেরিলারা পাঁচ সাতটি বোমা নিক্ষেপ করিয়া সিপাহীদের একটি চলন্ত মোটর ট্রাক বিধ্বস্ত করে, এবং আট দশ জন সিপাহী তাহাতে হতাহত হয়।

সুসং শহরের ঠিক উত্তরের ভবানীপুর পাহাড হইতে অকস্মাৎ রাইফেল ও স্টেনগান চালাইয়া বিদ্রোহীরা টহলদারী একদল সিপাহীকে আক্রমণ করে।

এই আক্রমণে দুই জন সিপাহী নিহত হয়। সারা জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাস এই ভাবে চোরাগোপ্তা আক্রমণ ও সংঘর্ষ চলিতে থাকে।

ঠিক এই সময় (১৯৫০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে) পাকিস্তান ও ভারতের বিভিন্ন স্থান আবার এক নারকীয় ভ্রাতৃহত্যার ধ্বংসযজ্ঞে নিক্ষিপ্ত হইল। কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্তে বাংলা বিহার ও আসামে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিল। মার্চ ও এপ্রিল মাসে বিহার ও আসাম হইতে দলে দলে মোহাজেরগণ (মুসলমান উদ্বাস্তু) পূর্ববঙ্গে আসিয়া পুনর্বাসনের জন্য লীগ সরকারের দ্বারস্থ হইল। এই বারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লীগ সরকারের নিকট আসিল "শাপে-বর" হইয়া। সে এই সুযোগে এক ঢিলে দুই পাখি মারার হীন চক্রান্ত ফাঁদিল। পূর্ব পাকিস্তান সরকার অবিলম্বে উক্ত মোহাজেরদের এই সংগ্রামী অঞ্চলের থানাগুলিতে আনিয়া সমাবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুপরিকল্পিতভাবে পুলিস সিপাহীদের দিয়া আদিবাসীদের গ্রামগুলিতে একটা ভীষণ অত্যাচার ও নির্যাতনের বন্যা বহাইয়া দিল। মুসলমানদের পুনর্বাসনের জন্য জোর জুলুম করিয়া আদিবাসী চাষীদের জমি, বাড়ি ও গ্রাম হইতে উচ্ছেদ করিতে লাগিল। প্রথমে সুসং, দুর্গাপুর ও কলমাকান্দা থানার গ্রামে গ্রামে তাহারা বিহারী মোহাজেরদের বসাইল। পরে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে আসামের মোহাজেরদের আনিয়া হালুয়াঘাট নালিতাবাড়ি ও শ্রীবর্দি থানার গ্রামে গ্রামে সংগ্রামী কৃষকদের জমি বাড়িতে জোর করিয়া বসাইয়া দিলেন। আদিবাসীদের উচ্ছেদ করার জন্য অসংখ্য আনসার পুলিস, সিপাহী ও ৭৮টি হাতী ব্যবহার করা হইল। এই সীমান্তের কাংসা, ঝিনাইগাতী, বনকুড়া, কাকড়কান্দী, মানপাড়া, জুগলী, ভুবনকুড়া, গাজির ভিটা, ঘোষগাও, মাইজপাড়া, ভেদীকুড়া, জিগাতলা, লেঙ্গুরা, চৈতন্যনগর, খাড়ৈন, পাঁচগাঁও প্রভৃতি ইউনিয়নের প্রায় ১৫০টি গ্রাম হইতে আদিবাসী কৃষকদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা হইল। ইহা ছাড়া আংশিক ভাবে উচ্ছেদ করা হইল আরো অনেক গ্রাম। এই সময় গ্রামের সমস্ত

যুবক ও মোড়লদের সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তার করিয়া ময়মনসিংহ জেলে বন্দী করা হইল; অসহায় শিশু ও নারী পুরুষদের জোর করিয়া টানিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া পথের "ফকির" করা হইল। ময়মনসিংহ জেল হাজতে অকথ্য নির্যাতনের ফলে ২৫ জন আদিবাসী কৃষক সন্তান প্রাণত্যাগ করেন, এবং প্রায় শতাধিক বন্দী নানা ধরনের জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সুযোগে এই ভাবে সংখ্যালঘু কৃষকদের সমূলে উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে সংগ্রামী কৃষকগণ তখন ব্যাপক প্রচার আন্দোলন শুরু করেন। তাহারা বহিরাগত মোহাজেরদের নিকট এই অঞ্চলের জমিদারী প্রথা তথা টঙ্ক প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনের সমস্ত ইতিবৃত্ত বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন, গোপনে ও প্রকাশ্যে সভা বৈঠক করেন এবং ইশ্‌তেহার ও পোস্টার দেন। মোহাজেরদের নিকট তাহারা আবেদন করেন, স্থানীয় কৃষকদের জমি বাড়ি দখল না করিয়া জমিদার মহাজনদের খাস পতিত ও খামার জমিতে বসার জন্য। সুসং-এ বিহারী কৃষক উদ্বাস্তুগণ এই প্রচার আন্দোলনে তেমন সাড়া না দিলেও আসাম প্রত্যাগত মোহাজেরগণ কিছুটা সাড়া দেয়। হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ী থানার কোন কোন জমিদারের জমি ও খামার জমি তাহারা দখল করিয়া বসিল। লীগ সরকার তখন উদ্বাস্তুদের এই মনোভাব টের পাইয়া তাহাদের উপরেও অত্যাচার উৎপীড়ন চালায়। কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়, কাহাকেও বা অন্যত্র দূরে সরাইয়া দেওয়া হয়। বাদবাকি উদ্বাস্তুদের নানাভাবে উত্তেজিত প্রলুব্ধ করিয়া এমনকি লাঠির ভয় দেখাইয়া আদিবাসী কৃষকদের জমি বাড়ি গ্রাম দখল ও অস্থাবর সম্পত্তি লুণ্ঠনে লাগানো হয়। হিংস্র পূর্বপাক রাইফেল বাহিনীর সিপাহীরা প্রায় দুই বৎসর-কাল জোর জুলুম অত্যাচার এমনকি নির্বিচারে নরনারী শিশু হত্যা করিয়াও সংগ্রামী চাষীদের যে গ্রামগুলি দখল করিতে পারে নাই, এইবার এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সুযোগে অচেতন কৃষক জনতাকে পুরোভাগে ঠেলিয়া দিয়া সংগ্রামী

কৃষকদের উচ্ছেদ করার মতলব লীগ সরকার হাসিল করিল। সুদীর্ঘকাল স্থানীয় মুসলমান কৃষকদের দ্বারা যাহা করানো সম্ভব হয় নাই, এই দাঙ্গার পটভূমিতে বহিরাগত (বিহারী, অসমীয়া) মুসলমান কৃষকদের সাহায্যে তাহাই করা হইল। অসংগঠিত চাষীদের সংগঠিত কৃষকদের বিরুদ্ধে শিখণ্ডী হিসাবে দাঁড় করাইয়া লীগ সরকার কার্যোদ্ধারে অগ্রসর হইল।

সুদীর্ঘ দিনের বহু আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী এই অঞ্চলের কৃষকদের সংগ্রামের সম্মুখে তখন এক কঠিন সমস্যা দেখা দিল। জমিদার-সামন্ততন্ত্রের রক্ষক সিপাহী পুলিস দল অচেতন উদ্বাস্তু মুসলমানদের পিছন হইতে সশস্ত্র ভাবে দমননীতি চালাইয়া বিদ্রোহী চাষীদের কাবু করিতে লাগিল। এই সময় মে মাসে কড়ই-তলা গ্রাম রক্ষা করিতে যাইয়া এক সংঘর্ষে উভয় পক্ষে শুধু কয়েকজন কৃষক সন্তানের প্রাণ গেল। শত্রুপক্ষ উদ্বাস্তু জনতার আড়ালে থাকিয়া সম্পূর্ণ অক্ষতই রহিয়া গেল। এই নূতন পরিস্থিতিতে বিপ্লবী কৃষক-নেতৃত্বের সম্মুখে সংগ্রামের নূতন কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজন জরুরী হইয়া দেখা দিল। কারণ পুরাতন পদ্ধতিতে সংগ্রাম চালানোর অর্থ কৃষকদের বিরুদ্ধে কৃষকের লড়াই।

সুসং এলাকার দাম্বুক শিবিরে সংগ্রামী কৃষকদের ৫ দিন ব্যাপী এক সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হইল যে বর্তমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দুর্গত মুসলমান উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রাম চালানো সম্ভবপর নয় এবং তাহাদের ডিঙাইয়া শত্রুর সশস্ত্র বাহিনীকেও আক্রমণ করা অসম্ভব। এই অবস্থায় বিদ্রোহী কৃষকদের সংগ্রামের ধারা ও কৌশল পরিবর্তন একান্ত অপরিহার্য। এই পট-ভূমিতে এই অঞ্চলের কৃষক নেতৃত্ব সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম বন্ধ করিলেন এবং নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন পরিচালনার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। তদনুযায়ী পূর্ব বাংলার সমস্ত কৃষক দরদী ও গণতান্ত্রিক নেতা ও দলের নিকট জমিদারী প্রথা, টঙ্ক প্রথা অবসানের জন্য সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করার আবেদন জানাইয়া সশস্ত্র সংগ্রাম প্রত্যাহার করিলেন।

এমনিভাবেই শেষ হইল এক গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রামের যুগ। ঋতুচক্রের আবর্তনে বৎসর ঘুরিয়া চলে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও শীর্ণা বুড়ীগঙ্গার বুকে প্রবাহিত হয় নিত্য নব স্রোতধারা। পূর্ব বাংলার জনগণের মনে আসে আবার নতুন করিয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের চেতনা। সমস্ত শ্রেণীর জনতার মধ্যে দেখা দেয় গণ-আন্দোলনের দুর্বার জোয়ার। এই পরিবর্তিত পটভূমিকায় সশস্ত্র কৃষক-বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতের ফলে ভাঙিয়া পড়ে লীগ-শাহীর স্বৈরতন্ত্রের ভিত, উচ্ছেদ হয় ঘৃণ্য টঙ্ক আর জমিদারী প্রথা। সুদীর্ঘ কালব্যাপী বিভিন্ন ধারায় পরিচালিত কৃষক সংগ্রাম এতদিনে লাভ করে আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য। সার্থক হয় টিপু পাগল, দুবরাজ, রাসমণি, সুরেন্দ্র প্রমুখ বীর শহীদদের আত্মবলিদান।

সোমেশ্বরী, ভোগাই, গণেশ্বরীর বুকে আজও বহিয়া যায় অগণিত অশান্ত ঢেউ, আর তাহারই কলতান প্রতিধ্বনিত হয় বেলাভূমিতে ও দূরের পাহাড়ে শহীদদের সমাধিক্ষেত্রে। মৃদু বাতাসের অশরীরী কণ্ঠে শোনা যায় শহীদদের জয়গান। এই অঞ্চলের দিগন্তজোড়া বিস্তীর্ণ ক্ষেতে ক্ষেতে দোলে সেই গানের সঙ্গে পাকা ধানের শীষগুলি। এই ধান রক্ষার জন্যই প্রাণ দিয়েছিল জানা অজানা অসংখ্য কৃষক সন্তান। এই অঞ্চলের অমর জনতা আজও ভোলে নাই সেই রক্তরাঙা অসংখ্য সংগ্রামের অমর কাহিনী। কিন্তু সত্যাভিমানী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আজও সে কাহিনী ধরা পড়ে নাই, আজও তাহা স্থান পায় নাই জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায়। সেদিন কি আসিবে না যেদিন টিপুসুলতানের পাশে লেখা হইবে টিপুপাগলের নাম, ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের পাশে স্থান পাইবে কৃষক মেয়ে রাসমণি, রেবতী, শঙ্খমণি, শহীদ কানাইলাল-ক্ষুদিরামের সঙ্গে শ্রদ্ধার আসন পাইবে মঙ্গলচাঁন, অগেন্দ্র, নয়ান আর রবি দাম? আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সেই ইতিহাস লেখা হইবে কবে?

ময়মনসিংহ জিলার শহীদদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ—

(১) ত্রিলোচন হাজং (৪৫) পাঁচগাও ইউনিয়নের গারাম পাড়া গ্রামে জন্ম। মৃত্যু ময়মনসিংহ হাসপাতালে ১৯৪২ সালে। ইনি পাঁচগাও অঞ্চলের কৃষক সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

(২) ফণি চক্রবর্তী (২২) ময়মনসিংহ সদরে আততায়ী কর্তৃক ছুরিকাহত হইয়া মৃত্যু ১৯৪৩ সালে।

(৩) লালমোহন হাজং (২৪) নালিতাবাড়ি থানা—মানপাড়া গ্রামে জন্ম। ১৯৪২ সালে জামালপুর হাসপাতালে মৃত্যু। ইনি নালিতাবাড়ি অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

(৪) মণি চক্রবর্তী (২৫) সেরপুর টাউনের বাগ্‌রাশা গ্রামে জন্ম। মৃত্যু ১৯৪৩ সালে। ইনি সেরপুর অঞ্চলের হদি ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নানকার আন্দোলন গড়িয়া তোলেন।

(৫) ভানু মজুমদার (২৩) ১৯৪৩ সালে ময়মনসিংহে মৃত্যু।

(৬) ভিখা চৌহান (২৫) মৃত্যু ১৯৪৪ সালে। সেরপুর এলাকায় দিনমজুর ও নানকার আন্দোলনের অন্যতম কর্মী।

(৭) মহাবীর চৌহান (২৩) সেরপুর শহরে ঢাকলহাটি অঞ্চলে বিহারী শ্রমিকের ঘরে জন্ম। নানকার আন্দোলনের একজন কর্মী। মৃত্যু ১৯৪৫ সালে।

(৮) রাসমণি (৫০) সুসং দুর্গাপুর থানার অন্তর্গত ভেদিকুড়া

ইউনিয়নের বগাঝোরা গ্রামের এক ক্ষেতমজুরের বিধবা স্ত্রী। তিনি ১৯৪২ সাল হইতে মহিলা সমিতির আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট কর্মী। সুসং অঞ্চলের হাজং প্রসূতিদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ দাই বা ধাত্রী। শিশু-রোগ, ভেষজ শাস্ত্র ও দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্না ছিলেন। ১৯৪৬ সালে বহেরাতলী গ্রামে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিয়া শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। কৃষক-রমণীর মধ্যে রাসমণি প্রথম শহীদ।

(৯) সুরেন্দ্র হাজং (২৭) সুসং দুর্গাপুর থানার মাইজপাড়া গ্রামের এক গরিব চাষীর ঘরে জন্ম। ইনি একজন টঙ্ক চাষী। ১৯৪৬ সালে বীরমাতা রাসমণির সহযোদ্ধা হিসাবে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

(১০) ভূপেন ভট্টাচার্য (৩৫) জন্ম নেত্রকোনা মহকুমার কাড়ইর গ্রামে। ১৯৩০ সালে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করায় আন্দামানে সেলুলার জেলে প্রেরিত হন। ১৯৩৮ সাল হইতে সুসং পরগণায় কৃষক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে হালুয়াঘাটে সন্ধ্যাকুড়া গ্রামে মৃত্যু বরণ করেন।

(১১) মঙ্গল চাঁন (৩০) জন্ম শ্রীবর্দি থানার লাউচাপড়া গ্রামের এক হাজং কৃষক পরিবারে। ১৯৪৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে লেঙ্গুরা হাটে এক সশস্ত্র সংগ্রামে পুলিসের গুলিতে নিহত হন।

(১২) অগেন্দ্র হাজং (৩১) জন্ম ভরতপুর গ্রামে। লেঙ্গুরা হাটে পুলিসের গুলিতে মারা যান।

(১৩) রেবতী (হাজং মেয়ে, বয়স-১৯) মৃত্যু লেঙ্গুরা হাটে পুলিসের গুলিতে।

(১৪) শঙ্খমণি (১৭) লেঙ্গুরা হাটে পুলিসের গুলিতে নিহত।

(১৫) সারথী (২১) কৃষককর্মী কাঙ্গাল দাসের স্ত্রী। লেঙ্গুরা হাটে মৃত্যু।

(১৬) বদরু (২৮) মৃত্যু সানখলার মাঠে।

(১৭) রহিম (৩০) সানখলার মাঠে পুলিসের গুলিতে নিহত।

(১৮) রামদয়াল সরকার (৫৮)
(১৯) রামচরণ (৬২)
} জাঙ্গালিয়া গ্রামের দুই বৃদ্ধ চাষী। কলসিন্দুর হাট হইতে ফেরার পথে পুলিসের গুলিতে নিহত।

(২০) সুদর্শন (২৭) হালুয়াঘাট থানার গবরাকুড়া গ্রামে জন্ম। কড়ইতলা গ্রামে সশস্ত্র পুলিসের সঙ্গে লড়াই করিয়া মৃত্যুবরণ করেন।

(২১) হরিসিং ডালু (২৫) হালুয়াঘাট থানার কুমারগাতী গ্রামে জন্ম। মৃত্যু কড়াইতলা গ্রামে পুলিসের গুলিতে।

(২২) সতীন্দ্র ডালু (৩০) নালিতাবাড়ি থানার মধ্যমকুড়া গ্রামে জন্ম। শালমারা গ্রামে এক সশস্ত্র সংগ্রামে পুলিসের গুলিতে নিহত।

(২৩) সর্বেশ্বর ডালু (৪০) নালিতাবাড়ি থানার গেরাপচা গ্রামে ধান দখল করিতে যাইয়া মৃত্যু।

(২৪) দুবরাজ (৩২) সুসং দুর্গাপুর নয়াপাড়া গ্রামে জন্ম। বিশিষ্ট গেরিলা-নায়ক, রানীপুর ময়দানে পুলিসের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষে মৃত্যু।

লেঙ্গুরা হাটের আরো শহীদের নাম আছে।

(২৫) ক্ষীরোদ (৪০) সানখলা গ্রামে জন্ম। মৃত্যু রানীপুর ময়দানে সশস্ত্র সংগ্রামে।

(২৬) অনন্ত হাজং (৫০) সুসং দুর্গাপুর থানার ভেদীকুড়া গ্রামে জন্ম। প্রথম জীবনে বৈষ্ণবপন্থী। ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। পরবর্তী কালে বিশিষ্ট কৃষক সংগঠক। রানীপুর ময়দানে সশস্ত্র সংগ্রামে মৃত্যু।

(২৭) নরেন্দ্র (৩৪) হালুয়াঘাট থানার ঘোষগাও গ্রামের একজন মধ্যচাষী। মৃত্যু—রানীপুর ময়দান।

(২৮) বীরঙ্গ-(৩০) সাং ঘোষগাও (হালুয়াঘাট) মৃত্যু—রানীপুর ময়দান।

(২৯) বিনোদ (৪২) মৃত্যু—রানীপুর ময়দান।

(৩০) চন্দ্র (৩৫) } দুই সহোদর ভাই। জন্ম—রানীপুর। মৃত্যু রানীপুর ময়দান।
(৩১) অনুরূপ (২৮) }

(৩২) যোগেন্দ্র (১৭) ভটপুর হাইস্কুলের ছাত্র। ধানসাইল গ্রামে জন্ম। পুলিসের গুলিতে রাংটিয়া পাহাড়ে গেরিলা ক্যাম্পে মৃত্যু ১৯৫০ সালে।

(৩৩) রবি দাম (২৮) ওরফে সাধু। সুনামগঞ্জ শহরে জন্ম। মোহনপুর গ্রামে (বিশরপাশা থানা) সশস্ত্র সংগ্রামে মৃত্যু।

(৩৪) চন্দ্র সরকার। পিতা গঙ্গাধর (৫২) হালুয়াঘাট থানার লক্ষ্মীকুড়া গ্রামে জন্ম। এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান নায়ক। স্বভাব কবি। কবিয়াল বলিয়া সর্বত্র পরিচিত। ১৯৪৯ সালে গ্রেপ্তার হইলে পুলিস তাহার মাথা হইতে পা পর্যন্ত লোহার হাতুড়ি দিয়া পিটায়। অকথ্য দৈহিক নির্যাতনের ফলে ১৯৫০ সালে ময়মনসিংহ মৃত্যু বরণ করেন।

(৩৫) দ্বিজমোহন হাজং (৩৩) সুসং থানার ভরতপুর গ্রামে জন্ম।

নিজের বাড়ির আঙ্গিনায় স্টেনগানের গুলি দ্বারা নিহত করা হয়।

(৩৬) বিজয় মণ্ডল (৪৫) হালুয়াঘাট থানার ঘোষগাও গ্রামে জন্ম। বিশিষ্ট কৃষককর্মী। ১৯৫০ সালে চেরাখালী জনক্যাম্পে মৃত্যু।

(৩৭) গোষ্ঠ সিংহ (৬৪) দুমণীকুড়া গ্রামে জন্ম। গেরিলা ক্যাম্পে ১৯৫০ সালে মৃত্যু।

(৩৮) মণীন্দ্র কর (৩১) সংবাদবাহী বিশিষ্ট কর্মী। মৃত্যু ১৯৪৯ সালে। নেত্রকোনা কাইলাটি গ্রামে জন্ম।

(৩৯) নয়ন সরকার (৪৫) সুসং দুর্গাপুর থানার কালিকাবাড়ি গ্রামে জন্ম। ১৯৪৭ সালে ভালুকাপাড়া গ্রামে অস্ত্র দখল করেন। ১৯৫০ সালে চেরাখালী ক্যাম্পে মৃত্যু বরণ করেন।

(৪০) বীরু হাজং (৩২) সুসং দুর্গাপুর থানার নলপড়া গ্রামে জন্ম। মৃত্যু—চেরাখালী।

(৪১) বলেশ্বর হাজং (২১) হালুয়াঘাট থানার লক্ষ্মীকুড়া গ্রামে জন্ম। মৃত্যু—১৯৪৮ সালে।

(৪২) গিরীন্দ্র, যতীন্দ্র, মহেশ্বর, কৃত্তিবাস, যোগেন্দ্র, পরমেশ্বর, অনন্ত, বিদ্যাধর জার্মনী, পদ্মমণি, নীলমণি প্রমুখ ৪০ জন কলমাকান্দা থানার জাগিরপাড়া গ্রামে এক গভীর রাত্রের অন্ধকারে পুলিসের গুলিতে নিহত হন।

(৪৩) কমল হাজং—ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যু—১৯৪৯ সাল।

(৪৪) ব্রজ মোহন— ,, ,, ,, ,,

(৪৫) সুরেন্দ্র ডালু (৩৬) ,, ,, ,, ১৯৫০ সাল

(৪৬) রবীন্দ্র— ,, ,, ,, ,,

(৪৭) গোপীনাথ— ,, ,, ,, ,,

(৪৮) ঘাওয়া রাম—ময়মনসিংহ জেলে মৃত্যু—১৯৫০ সাল

(৪৯) গোপাল— ,, ,, ,, ,,

(৫০) গৌরাঙ্গ— ,, ,, ,, ,,

(৫১) কেনারাম— ,, ,, ,, ,,

(৫২) জন্মেজয়— ,, ,, ,, ,,

(৫৩) রতিকান্ত প্রভৃতির জেলে মৃত্যু।

(৫৪) শচী রায় (৩৫) নালিতাবাড়ির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সতীশ চন্দ্র রায়ের পুত্র। ১৯৩০ সাল হইতে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। এই অঞ্চলের সশস্ত্র বিদ্রোহে বোমা প্রস্তুত করার সময় এক বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়।

(৫৫) ফণি চক্রবর্তী—(৩০) চান্দেরনগর নানকার আন্দোলনের সংগঠক, সর্পাঘাতে মৃত্যু।

(৫৬) সুখেন্দু ভট্টাচার্য—(২৫) রাজসাহী জেলে পুলিসের গুলিতে নিহত।

(৫৭) রজনী সরকার—(৩০) ঘোষগাও হালুয়াঘাট অঞ্চলের কৃষক-সংগঠক। ১৯৫০ সালে চেড়াখালি পুলিসের গুলিতে মৃত্যু বরণ করেন।

ময়মনসিংহ পাহাড় সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা ও সংগঠক ঃ—

১। শ্রীমণি সিংহ—পিতা কালীকুমার ; সুসং দুর্গাপুর। ইনি এই অঞ্চলের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা। ১৯২০-২১• সালে অসহযোগ আন্দোলনে ও বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। এক সময় মেটিয়াবুরুজ ও কলিকাতাব উপকণ্ঠে শ্রমিক সংগঠন গড়িয়া তোলেন। ১৯৩০ সালে রাজবন্দী হন, ১৯৩৫ সালে দুর্গাপুরে অন্তরীণ থাকাকালে এই অঞ্চলে কৃষক সংগঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন।

২। শ্রীললিত সরকার—পিতা জয়নাথ, গ্রাম লেঙ্গুবা, সুসং। ইনি এই অঞ্চলের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা। ১৯২০-২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩০ সালে নিজ গ্রামে প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করেন ও আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৩৬ সাল হইতে গ্রামে গ্রামে সারা ভারত কৃষকসভার সংগঠন গড়িয়া তোলেন। এবং এই কাজে তাঁহার সম্পত্তি দান করেন।

৩। শ্রীবিপিন গুন—পিতা টিকারাম ; লেঙ্গুরা, সুসং। এই অঞ্চলের বিশিষ্ট কৃষকনেতা।

৪। শ্রীপরেশ সরকার—বাগপারা। শিক্ষিত হাজং যুবক। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের প্রিয় নেতা।

৫। শ্রীজলধর পাল—পিতা বলরাম, নালিতাবাড়ি। ইনি

ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলে যোগদান করেন, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন। জেল হইতে মুক্তি পাইয়া নিজের জন্মভূমি ময়মনসিংহ পাহাড় সীমান্ত অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন গড়িয়া তোলেন।

৬। শ্রীজামেশ্বর সরকার—পিতা গৌরচরণ, নাগেরপাড়া, হালুয়াঘাট। শিক্ষিত হাজং যুবক। এই অঞ্চলের কৃষক সংগঠন গড়িয়া তোলায় প্রচুর অবদান রহিয়াছে।

৭। শ্রীরূপচাঁন সরকার—পিতা দয়ালচন্দ্র, ডাহাপাড়া হালুয়াঘাট। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের অন্যতম সংগঠক।

৮। শ্রীধীরেন্দ্র রায়,—পিতা ব্রজমোহন, সন্ধ্যাকুড়া, হালুয়াঘাট। একজন বিশিষ্ট জনপ্রিয় কৃষকনেতা, প্রথম জীবনে পাঠশালার শিক্ষক। এই অঞ্চলের আন্দোলনে অপরিসীম অবদান রহিয়াছে।

৯। শ্রীগজেন্দ্র সরকার—পিতা শরনাথ; ভরতপুর, সুসং। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। পরে সারা ভারত কৃষকসভার বিশিষ্ট সংগঠক।

১০। শ্রীরাজকুমার সরকার—পিতা অক্ষয়চন্দ্র,—কুমারগাতী, হালুয়াঘাট। ইনি ডালু সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট নেতা। দীর্ঘকাল গ্রাম পঞ্চায়েত ছিলেন। জমিদার-বিরোধী ভূমিকায় স্বাভাবিক চেতনা দেখা দেয়। পরে নিজের এলাকায় সারা ভারত কৃষকসভার সংগঠন গড়িয়া তোলেন।

১১। শ্রীঅনিল ডালু—পিতা নন্তীরাম, তন্তর, নালিতাবাড়ি। শিক্ষিত ডালু সন্তান। এই অঞ্চলে সংগঠন গড়িয়া তোলায় বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

১২। শ্রী হংসনাথ—পিতা হরকান্ত, রামচন্দ্রকুড়া, নালিতাবাড়ি

উচ্চশিক্ষিত হাজং যুবক। ময়মনসিংহ কলেজে ছাত্রাবস্থায় বিশিষ্ট ছাত্রনেতা। পরে এই অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘ দিন যাবৎ জেলে রাজবন্দী আছেন।

১৩। শ্রীভারত সাংমা—খড়খড়িয়া কান্দা, নালিতাবাড়ি। ইনি এই অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগঠন গড়িয়া তোলেন।

১৪। শ্রীরবি নিয়োগী—পিতা রমেশচন্দ্র। সেরপুর টাউন। ছাত্র-জীবনে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। ময়মনসিংহের সেরপুর কংগ্রেস কমিটির একজন বিশিষ্ট কর্মী। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে প্রথম কারাবরণ করেন। ১৯৩১ সালে সালধা মামলায় অভিযুক্ত হন এবং দীর্ঘদিন আন্দামান জেলে আবদ্ধ থাকেন। ১৯৩৭ সালে মুক্তি লাভ করিয়াই কৃষক আন্দোলনে যোগদান করেন। নানকার ও ভাওয়ালী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা।

১৫। শ্রীবল্লভী বকসী—পিতা গৌরকিশোর। সেরপুর টাউন। ছাত্রজীবন হইতেই বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৭ সাল হইতে কৃষক আন্দোলনে যোগদান করেন। সুসং পরগনার অন্যতম সংগঠক।

১৬। শ্রীতেজেশ নাগ (রামু) পিতা—যোগেশ চন্দ্র। সেরপুর পরগনার হাজং ও রাজবংশীদের মধ্যে সংগঠন গড়িয়া তোলেন।

১৭। শ্রীরাজকুমার বিশ্বাস—নাকুসী, নালিতাবাড়ী। হদি ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা। বেগার প্রথার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব করেন।

১৮। শ্রীভূপেন নাগ—পিতা দেবেন্দ্র চন্দ্র। নাগপাড়া সেরপুর। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়া কারাবরণ করেন। প্রথম জীবনে কংগ্রেস কর্মী, পরবর্তী কালে হদি ক্ষত্রিয় ও হাজংদের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনে যোগদান করেন।

১৯ শ্রীসুরেন্দ্র কোচ, শ্রীকৈলাস কোচ — গোবরা কুড়া, হালুয়াঘাট কোচ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা।

২০। শ্রীসেবারাম বানাই—জামগড়া, বানাই উপজাতীয়দের বিশিষ্ট নেতা। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্দোলন ও সংগঠন গড়িয়া তোলায় বিশেষ অবদান রহিয়াছে।

২১। শ্রীজিতেন মৈত্র—পিতা জগন্নাথ। বিপ্লবী দলের কর্মী। আন্তঃপ্রাদেশিক মামলায় অভিযুক্ত হন। মুক্তি পাওয়ার পর হইতেই এই অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

২২। শ্রীবলাই সরকার—কান্দুলী, সেরপুর পরগনার ভাওয়ালী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা।

২৩। শ্রীসমন বর্মণ—নন্নী—রাজবংশী সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট কৃষক-সংগঠক।